সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রদক্ষিণ

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫
প্রকাশক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর : অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২
প্রচ্ছদ-শিল্পী : বিমল দাশ
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই : বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

উৎসর্গ

দেবযানীকে

: রচনাকাল :

জানুয়ারী থেকে ১৩ই মে : ১৯৫৮ : মঙ্গলবার সন্ধ্যা

কলিকাতা

এই লেখকের অন্যান্য বই

অন্য নগর

এই মর্তভূমি

দূরের মিছিল

মনে মনে

মুখর লণ্ডন

ছায়া মারীচ

নতুন বাসর

ইভনিং ইন প্যারিস

জন সম্রাট

ব্যালেরিনা

দুর্গতোরণ

অন্তঃপুর

নীলকণ্ঠী (যন্ত্রস্থ)

॥ এক ॥

অন্ধকার থেকে আলোকে এসেছে।

কথাটা মা-বাবার মুখে বিজলী অনেকবার শুনেছে বটে কিন্তু আলো কোথায়! রাস্তায় একটাও বাতি জ্বলে না। ঘরের বাতি দুটোকেও সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়। বাইরে থেকে দেখা গেলেই মুশকিল। হাঁ হাঁ করে ছুটে আসবে খাঁকি-পোশাক-পরা ছেলের দল। ওদের কথা না শুনলে ধরে নিয়ে যায়। যুদ্ধের সময় অন্ধকারে লুকিয়ে থাকাই নাকি নিয়ম।

আর ঠিক এই যুদ্ধের সময় আলোর জন্যে ছটফট করে বিজলী। অন্ধকার ভারী বোঝার মতো মনে হয়। তাই সারা রাত সে ভোরের আশায় উদগ্রীব হয়ে থাকে।

ভোর হবার অনেক আগেই বিজলীর ঘুম ভেঙে যায়। একটা পাখি ডেকে ওঠে। নাম জানে না বিজলী। কবরখানায় অমন অনেক পাখি ডাকে সারাক্ষণ। জলের ছড়ছড় শব্দ আসে একটু পরেই। গান গাইতে গাইতে রাস্তায় জল দিয়ে যায় এ-পাড়ারই লোক।

মাথার কাছে ছোট জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে বিজলী। আলো ফুটে উঠছে একটু একটু করে। ঘণ্টা বাজিয়ে বার হল প্রথম ট্র্যাম। শব্দ করে একটা ঘোড়ার গাড়ি গেল। কবরখানার গাছের পাতার সিরসির শব্দ আসছে। ঘরে কিন্তু হাওয়া নেই একটুও। তক্তাপোশে শুয়ে ঘেমে উঠছে বিজলী।

আরও স্পষ্ট হল ভোরের প্রথম আলো। গোরু নিয়ে গয়লারা

যাচ্ছে। সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ করে বাড়ি বাড়ি কাগজ দিয়ে যাচ্ছে সেই পুরনো লোক। মশারি সরিয়ে উঠে পড়ল বিজলী।

বিজু—ও মা বিজু—একটু ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে শুয়ে শুয়েই ডাকে সরলা। ওঠবার ক্ষমতা নেই। উঠতে গেলেই হাঁপায়।

মার রকম দেখে মনে মনে হাসে বিজলী। ঠিক লক্ষ আছে তার দিকে। কিন্তু বিজলীকে অত ভয় কেন সরলার। আরও আগে তাকে ডেকে তুললেই তো হত।

কী বলছ ?

বলছিলাম যে—মানে—সরলা থেমে যায়।

বল না মা ?

বিশ্বাসদের বাড়ি আজ একবার যাবি ? সরলা করুণ চোখে মেয়ের দিকে তাকায়, যা না মা, ছটো ডিম চেয়ে নিয়ে আয়--

আমি পারব না রোজ রোজ অমন করে চাইতে। ছটা ডিম ওরা পাবে আমাদের কাছে। আজও ফেরত দেয়া হয় নি। ওরা কী ভাবে আমাদের বল তো ?

কী আবার ভাববে! অভাবের সময় সকলেই লোকের কাছে এটা ওটা চায়। জানিস তো বিজু, শুধু ডাল-ভাত খেতে তোর বাবার কষ্ট হয়—

জানি। কিন্তু আমি কোথাও কারুর জন্যে কিছু চাইতে যেতে পারব না। পরের কাছে চেয়ে খাওয়ার চেয়ে না খেয়ে থাকা ভালো--

শাড়িটা ঠিক করে নিয়ে বিজলী কলের পাশে এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ এ-বাড়ির কারুর সঙ্গে একটা কথাও বলতে ইচ্ছে করে না তার।

মেয়ের মেজাজ দেখে বসন্ত খুকখুক করে হেসে ওঠে। বিজলীর

রাগের কারণ জানতে বাকি নেই তার। ওই বয়সের মেয়েদের মাথা অমন গরম হয়েই থাকে। ললিত ফিরে এলে বুঝবে মেয়ে বাপ-মায়ের ওপর তার আজকের রাগটা একেবারেই অহেতুক।

সরলাকে লক্ষ করে চাপা স্বরে বসন্ত বলে, বিজুর মেজাজ সকাল থেকেই বিগড়ে গেল যে।

সরলা হাসে, তোমার ওপর ষোলো আনা রাগ।

কেন বাপু? না হয় ললিত যুদ্ধে গেছে, তাতে হয়েছে কী?

বেচারাদের দেখা'সাক্ষাৎ হয় না একেবারে। শমুটারও তো কোনো খবর পাই না।

ঠিক আছে তারা। পুরুষ মানুষ, জোয়ান বয়স। রাজার পক্ষে যুদ্ধ করে যদি জিতিয়ে দিতে পারে তাহলে বাহাদুরি তো আমাদেরই।

তা ঠিক, আমরা জিতব সে তো জানা কথাই। দম নিয়ে সরলা আবার বলে, বিজু ভাবে তুমি ললিতকে জোর করে যুদ্ধে পাঠিয়েছ।

পাঠাব না? নতুন কোট প্যাণ্ট পরে যুদ্ধ করতে গেল। বাপ রে, খাতির কত! এত্ত টাকা নিয়ে ফিরে যখন আসবে ললিত, জানলে সরো, সরলার কানের কাছে মুখ নিয়ে বসন্ত বলে, চাঁদ-মুখ দেখে মেয়ের রাগ তখন টুপ করে পড়ে যাবে --

আঃ আস্তে। শুনতে পাবে যে মেয়ে।

বাড়িটা যে পাকা সে কথা বুঝতে সময় লাগে। দুখানি ছোট ছোট ঘর। ক্ষয়ে ক্ষয়ে দেয়াল থেকে ইট বেড়িয়ে পড়েছে। একটু জোরে চাপ দিলে দেয়াল থেকে ঝুরঝুর করে চুন ঝরে পড়ে।

একটা ঘরে পায়া-ভাঙা টেবিল। পুরনো চেয়ার আর তক্তাপোশ সে চেয়ারটা ব্যবহার করা যায় না তাই তার ওপর এর্ধে কেন? প্রভু হয়েছে। লোক এলে সেটা বিছিয়ে দেয়া হয়রই। বিশ্বাস রাখো

আর একটা ঘরে রাজ্যের জঞ্জাল জমা কন্তু ঈশ্বরের সহভাগিতা নানা রঙের ক্যালেণ্ডার। কোনোটায় যীশ

মেরীর কোলে যীশু। কোনোটায় ভেড়ার পালের সঙ্গে লাঠি হাতে যীশু। কিন্তু সব-কটি ক্যালেণ্ডারই অনেক বছর আগেকার। ঘরের শোভা বাড়াবার জন্যে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। এটাই এদের খাবার ঘর।

মুখ ধুয়ে একটা বাঙলা বাইবেল হাতে সরলার পাশে এসে বসল বসন্ত। খুঁজে খুঁজে সে-বইএর একটা জায়গা বের করে রাখে ও। বিজলী এলে বাইবেল পড়ে প্রার্থনা করবে।

কিন্তু বিজলী আসে না সহজে। রান্নাঘর থেকে ঠুনঠুন ঠকঠক শব্দ ভেসে আসে। মনে মনে একটু বিরক্ত হয় বসন্ত। মেয়েটার ধর্মে কর্মে তেমন মতি নেই যেন। হাজারবার বলা হয়েছে, সকাল-বেলা প্রার্থনা সেরে যেন সংসারের কাজ শুরু করা হয়, কিন্তু কে শোনে কথা!

ওরে ও বিজু—একটু জোরেই ডাকে বসন্ত।

সাড়া দেয় না বিজলী। নিঃশব্দে এসে তক্তাপোশের ওপর মায়ের পায়ের কাছে বসে। বাপ কিছু বলবার আগে দুটো আঙুল দিয়ে চোখ চেপে রাখে। প্রার্থনা করবার রীতি এটাই এদের।

তেমনি চোখ বন্ধ করে বসন্ত এবার ভক্তিভরে বলে যায়, পিতঃ, আমাদিগকে এমন দুর্দিনেও যে অন্ন দিতেছ তজ্জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। সরলা অনেকদিন ধরিয়া ভুগিতেছে। তাহার কষ্ট লাঘব কর। তাহাকে সারাইয়া দাও। তোমার পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে আইস্থক। আমেন!

তারপর বাইবেল পড়ে বসন্ত, সদাপ্রভু আমার পালক, আমার ভা[illegible]র হইবে না—

শাড়িটা [illegible] ছটফট করে। বুকের ব্যথাটা বাড়ে বোধ হয়। হঠাৎ এ-বাড়ির কারুর [illegible] আর কোনো দিকে। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে তার। [illegible]ল ফুটছে টগবগ করে। ভাতের হাঁড়ি

মেয়ের মেজাজ দেখে বস

একটা রুটি আর এক কাপ চা। রুটিতে মাখন নেই। আজকাল থাকেও না কোনোদিন। কিন্তু কেউ আর কথা বলে না। চুপচাপ খেয়ে যায়। টেবিলের ওপর ঝুরঝুর করে রুটির গুঁড়ো ঝরে পড়ে।

ওষুধটা ফুরিয়েছে বুঝি সরো? ভয়ে ভয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে বসন্ত।

না না, ফুরবে কেন, অনেক আছে এখনও—

না বাবা, এক ফোঁটাও নেই, বিজলী বলে ওঠে বেশ জোরেই।

কথা শুনে বসন্তর মুখটা কালো হয়ে যায়। সে আস্তে আস্তে উঠে শিশিটা তুলে নিয়ে দেখে সত্যি সেটা খালি। ফিরে এসে আবার গালে হাত দিয়ে ভাঙা চেয়ারে বসে পড়ে সে। আহত দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

বিব্রত হয়ে সরলা বলে, মাপ কর আমাকে। তোমার ভাবনা হবে বলে মিছে কথা বলেছি তোমাকে—

প্রার্থনার পরেই মিছে কথা বলতে পারলে তুমি সরো! ছি, এমনভাবে মিছে কথা বলতে নেই।

কি করব বল! অসুখটাও যে সারে না আমার ছাই, আঁচলটা অকারণেই একবার চোখের ওপর বুলিয়ে নেয় সরলা, আর কত ভাবনা করবে তুমি? কোথা থেকে অত পয়সা পাবে!

মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে বসন্ত। সরলার কথার উত্তর দেয় না। উঠে দাঁড়ায় একটু পরে। একটা বাটির মধ্যে থেকে কতগুলো খুচরো পয়সা নিয়ে মনে মনে কী হিসেব করে। বাজারে বেরিয়ে পড়বার সময় হল।

সরলার কথার উত্তরে বলে বসন্ত, প্রভু যে পরীক্ষায় ফেলবে সে তো জানা কথা। তা বলে তার ওপর বিশ্বাস হারাবে কেন? প্রভু দুঃখ দিলে, দুঃখ দূর করবার ভারও তো তারই। বিশ্বাস রাখো সরো—বিশ্বাস রাখো। পরীক্ষা দু-দিনের কিন্তু ঈশ্বরের সহভাগিতা চিরদিনের—

সেই পুরনো কোটটাই গায়ে চড়ায় বসন্ত। শ্যাওলা রঙের পাতলা একটা কোট। সেটা গায়ে না দিয়ে কখনও রাস্তায় বার হয় না সে।

তোমার অসুখের চিকিৎসার জন্যে আমার পয়সার অভাব হয়েছে কখনও? প্রভুর আশীর্বাদ থাকলে ভাবনা কী! পয়সা আমি যোগাড় করব ঠিক। কিন্তু মিছে কথা বলে তুমি শুধু শুধু পাপের বোঝা বাড়াও কেন?

স্বামীর কথা শুনে চোখে হঠাৎ জমে ওঠা জল শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছে ফেলে সরলা বলে, আর কখনও বলব না। কী দুঃখে যে মিছে কথা বলি প্রভুই জানেন। আমার কোনো পাপ লাগবে না, তুমি দেখে নিও।

বাজারে বেরিয়ে যায় বসন্ত। রোদের তেজ বেড়ে গেছে এর মধ্যে। তবু কোটের বোতাম ভালো করে লাগিয়ে ও পথ চলে। সামনেই বাজার। খুব বেশি দেরি হয় না তার সেখানে পৌঁছতে।

সরলার বিছানা ছেড়ে ওঠা বারণ। কিন্তু সংসারের সমস্ত ভার ওই ছোট মেয়েটার ওপর চাপিয়ে দিয়ে কেমন করে শুয়ে শুয়ে আরাম করবে সে। ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকায় সরলা। বসন্ত নেই। শাড়িটা শক্ত করে জড়িয়ে কোনোরকমে উঠে দাঁড়ায় সে। তারপর আস্তে আস্তে সাবধানে রান্নাঘরে চলে আসে।

এখনও গেলি না বিজু? যা না মা একবার বিশ্বাসদের বাড়ি। কখন থেকে বলছি তোকে—

তুমি আবার উঠে এলে কেন মা? বাবা এসে রাগারাগি করবে জান না?

করুক গে। একা কত করবি তুই। যা যা, আমি দেখছি ভাতটা—

বিজলী বলে, বাবা আসুক বাজার থেকে ? দেখি ডিম-টিম কিছু আনে কি-না।

কিচ্ছু আনবে না রে। পয়সাই নেই মোটে। কয়েক আনা খুচরো নিয়ে বাজারে বার হল—এই ফাঁকে তুই চলে যা বিজু। লক্ষ্মী মেয়ে!

এঁটো চায়ের কাপ ধুয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবে বিজলী। মার কথা ভেবে দুঃখ হয় তার। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে সে বেরিয়ে পড়ে।

বাইরে বেরিয়ে বিজলী ঠিক করে, ডিম ধার চাইতে কিছুতেই সে আজ যাবে না বিশ্বাসদের বাড়ি। থাক না বাড়িতে কয়েকটা মুরগি ওদের। রোজ রোজ লোকের বাড়ি চাইতে গেলে কেউ দেয় কখনও! এখন কিছু বলে না বটে, কিন্তু দেবার সময় মুখের ভাবটা কেমন অপ্রসন্ন হয়ে থাকে বিশ্বাস-গিন্নীর। দুদিন পর বিজলীর মুখের ওপর হয়তো বলে বসবে, আর দিতে পারব না বিজু। তাই বিজলী আগে থেকেই সতর্ক হতে চায়।

কী যে হয়েছে কয়েক মাস থেকে! কিছুই পাওয়া যায় না কোথাও। চারদিকে শুধু নেই নেই রব। কবরখানার গেটের সামনে চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবে বিজলী। ললিতও নেই। কবে আবার ফিরে আসবে কে জানে! যুদ্ধ শেষ হবে কবে! হে ঈশ্বর, যুদ্ধ শেষ করে দাও এবার। ললিত যেন ভালোয় ভালোয় ফিরে আসে।

কবরখানার লাল-সুরকি-ঢালা রাস্তার দিকে একমনে বিজলী তাকিয়ে থাকে। কড়া রোদ্দুরে কপাল ঘেমে ওঠে তার। কবরখানার মধ্যে থেকে গরম হাওয়া ছুটে এসে গায়ে লাগে। হঠাৎ যেন ভয় পায় বিজলী। ওখানে যারা আছে তারা কেউ বেঁচে নেই। কবরগুলির দিক থেকে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে হনহন করে হাঁটতে থাকে। ডিম যোগাড় করবার কথাটা আবার

যেন নতুন করে মনে পড়ে তার।

ওদিকে বিজলীর প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে ওঠে সরলা। মেয়েটা এখনও ফেরে না কেন। বিশ্বাসদের বাড়ি তো এক মিনিটের পথ। বসন্ত আগে ফিরে এলে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে হবে সরলার। দিন দিন বড় অলস হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। কোনো কাজে আর তেমন মন নেই। যেন ললিত একাই যুদ্ধে গেছে। যেন সে হেরে যাবে—মরে যাবে। মন্দ ভাবনা নিয়ে মেতে থাকলে কাজে মন লাগে নাকি মানুষের। মন তো খারাপ হবেই তাহলে।

কিন্তু মনে মনে বৃথাই মেয়েকে দোষ দেয় সরলা। হাঁপাতে হাঁপাতে গোটা চারেক ডিম হাতে নিয়ে ফিরে আসে বিজলী। মুখ দেখে মনে হয় মায়ের ভাবনার কথা তার অজানা নেই। বসন্ত তার আগে ফিরে এলে অশান্তির সৃষ্টি হত।

দেখলি বিজু, হাসিমুখে সরলা বলে ওঠে, না দিয়ে পারে কখনও ওরা? নে মা, এবার তাড়াতাড়ি দুটো ডিমের কারি করে দে। আমার জন্যে করবি না বলছি খবরদার। তুই আর তোর বাবা খাবি শুধু। দু দিন চালিয়ে দে তো দেখি। এর মধ্যে যদি শমুর টাকাটা এসে পড়ে—

সরলার কথা বিজলী শোনে কিনা ঠিক বোঝা যায় না। বোধহয় শোনে না। তবে দুটো ডিমই সে ধোয় বটে। একটা বাটিতে জল ভরে উনুনের ওপর বসিয়ে দেয়।

সরলা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি যাই এবার শুয়ে পড়ি গে। ভালো রোগ রে বাপু, জ্বর নেই, জ্বারি নেই, শুয়ে শুয়ে আরাম কর শুধু, কথা ঘুরিয়ে সরলা বলে, বিজু এবার ডিম দুটো ছেড়ে দে। হ্যাঁ রে, তা বিশ্বাস-গিন্নী ফেরত দেবার কথা কিছু বলল না?

বিশ্বাসদের বাড়ি যাই নি তো আমি। মধুর বাড়ি থেকে চারটে ডিম চেয়ে আনলাম। বিশ্বাসদের বাড়ি গেলে আজ ওরা দিত না কিছুতেই।

বিজলীর কথাটা বিশ্বাস করতে সময় লাগে সরলার। এই কারণেই মেয়ের ওপর অসন্তুষ্ট হয় সে মাঝে মাঝে। কাছাকাছি এত আপনার লোক থাকতে কী দরকার ছিল পরের বাড়ি গিয়ে ডিম চেয়ে আনবার। দৃষ্টি বিষণ্ণ হয়ে ওঠে সরলার।

মধুর বাড়িতে গেলি কেন তুই? হিঁদুদের সঙ্গে অত মেশামেশি ভালো নয়। কতবার বারণ করেছি না তোকে? ছি ছি, ও কী ভাববে বল তো আমাদের!

রান্নায় পুরোপুরি মন দিয়েছে তখন বিজলী, কিছু ভাববে না মা! ভালোবেসে দেবে জানতাম তাই গিয়েছিলাম। তুমি মধুকে পর বলেই বা ভাব কেন? শমুর বন্ধু, ললিতের বন্ধু, ও-ও তো আমাদের আপনার লোক।

দূর, ওরা কখনও আমাদের আপনার লোক হয়? মনে মনে হাসবে ঠিক দেখিস।

হাসুক না, বিজলী হেসে বলে, আর বিশ্বাসরা কি হাসে না তুমি ভাব? মধু যদি বা হাসে, কখনও রাগবে না তা আমি বলে দিলাম। কিন্তু বিশ্বাসরা হাসে আবার রেগেও যায়—

বিশ্বাসদের ওপর তোর অত রাগ কেন বল তো বিজু?

রাগ নয় মা, আমি যাই তো প্রায়ই, তাই মনের কথা টের পাই সকলের।

ছাই পাস—

আরও কী বলতে যাচ্ছিল সরলা কিন্তু বাধা দিয়ে বিজলী তাকে এবার শুয়ে পড়তে বলে। বসন্ত ফিরে আসবে এখুনি। কথা শোনে সরলা। সোজা এসে সে বিছানায় শুয়ে পড়ে। মুখ দেখলে কে বলবে, একটু আগে উঠে সে সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে রান্না-ঘরে বসে মাথা ঘামাচ্ছিল।

এখন একটু ঘুমও পায় সরলার।

॥ দুই ॥

অসময়ে বর্ষা নেমেছে।

কাচের কুচির মতো জলের ফোঁটা টিনের চালের ওপর সারা দিন একটানা শব্দ করে।

সেই আওয়াজে আর ভিজে মাটির গন্ধে ভারী বাতাসের ঝাপটায় মধু থেকে থেকে কেমন যেন বিভোর হয়ে যায়।

হঠাৎ এক সময় বসন্ত উঠে জানলা বন্ধ করে দিল। ঘরে ছাঁট আসতে আরম্ভ করেছে। বসন্তর গায়ে কয়েকটা ফোঁটা পড়েছে। আর একটু পরে কফিনগুলো ভিজে যেতে পারে।

জানলা বন্ধ করে দিতেই মধু হাঁ হাঁ করে উঠল, কর কি দাদা, ঘর অন্ধকার হয়ে গেল যে—

আলো জ্বেলে নে, কফিন ভিজে গেলে সাহেবের ক্যাচক্যাচি কি তুই শুনবি?

একেই মেঘে মেঘে বিকেল চারটেয় চারপাশ অন্ধকার হয়ে আছে, জানলা বন্ধ করায় ঘর একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। তবু আর কোনো কথা না বলে মধু আস্তে আস্তে উঠে আলো জ্বেলে নিল।

বসন্তর সঙ্গে কথা বলবার সময় মধু প্রায়ই এমনি চুপ করে যায়। তার মুখের ওপর কোনোদিনও সে বোধহয় কথা বলতে পারবে না।

বিজলীর মুখ চেয়ে মধুকে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়। বসন্ত যে সব সময় খিটখিট করে তা নয়। কিন্তু মধুর ওপর একটা চাপা বিদ্বেষ তার মন ঘিরে থাকে। অথচ বিজলী কিংবা মধু কাউকে মুখ ফুটে সে কিছু বলতে পারে না।

হয়তো মেয়েকে কিছু বলবার দরকার নেই। বসন্ত জানে তার মন পড়ে আছে ললিতের ওপর। আজ দু বছর হল সে যুদ্ধে চলে গেছে।

কিন্তু লোকটার হলই বা কি? অনেকদিন তার কোনো চিঠি আসে নি। বিজলীকে জিজ্ঞেস করলে সে কিছু বলে না, ছলছল চোখে চুপ করে সরে যায়। যাক তবু রক্ষে, শ্যামুয়েলের চিঠি থেকে মাঝে মাঝে বোঝা যায় ললিত বেঁচে আছে।

হ্যাঁরে মধু, ইঞ্চি দিয়ে একটা মাপ ঠিক করে নিয়ে বসন্ত জিজ্ঞেস করল, ললিতের কোনো খবর পাস?

গম্ভীর মুখে মধু বলল, না।

দু-একদিন অন্তর চিঠি লিখে যা না রে বাপু, ছেলে-ছোকরা তোরা, লিখতে কষ্টটা কি?

আরও গম্ভীর হয়ে মধু বলল, আচ্ছা লিখব-খন।

মুখে বললেও মধু জানত, কোনোদিনও চিঠি লিখে ললিতের খবর নিতে সে পারবে না। ললিত না থাকলে মধু যেন বেঁচে যায়। সে একবার ভাবল হয়তো এমন করে মানুষের অমঙ্গল কামনা করা ঠিক নয়। ললিত মরলে যে তার পক্ষে বিজলীকে পাওয়া সহজ হবে সে-কথা জোর করে কে বলতে পারে।

অনেক দিন তো হল। মধু মনে মনে হিসেব করে দেখল, হ্যাঁ তা প্রায় বছর তিন-চার হবে। মাঝে কোথা থেকে ললিত এসে যেন সব গোলমাল করে দিল।

বাইরে বৃষ্টির ঝমঝম আওয়াজ আরও বেড়ে উঠেছে। আর সেই আওয়াজ ছাপিয়ে ঘরের মধ্যে কফিন তৈরীর ঠকঠক শব্দ উঠছে। ওদিকে সময়ও হয়ে এল। ওরা বাড়ি ফিরবে কেমন করে কে জানে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মধু বলল, বাড়ি যাই কেমন করে? এ-জল তো এখন আর থামছে না।

তা বটে, পকেট থেকে বিড়ি বের করে বসন্ত, বৃষ্টি আর আসবার সময় পেল না, ঠিক বাড়ি ফেরবার সময়—

মধু হতাশ চোখে চুপ করে বসে থাকে।

এখন বিজলী কী করছে? হয়তো গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে ললিতের কথা ভাবছে।

মধুর সবচেয়ে বেশি রাগ হয় শ্যামুয়েলের ওপর। সেই তো যত নষ্টের মূল। কী দরকার ছিল অত খাতির করে ললিতকে বাড়ি ঢুকতে দেয়ার। সাত দিনের মধ্যেই সে কেমন সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলল।

আর মধু? নিজের ওপর তার রাগ হয়। এত বছরেও বিজলীকে সে তার মনের কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারল না। এখন মনে মনে শুধু ললিতকে অভিশাপ দিয়ে আর হবে কি। মাঝে মাঝে শুধু অসহ্য জ্বালায় তার মরে যেতে ইচ্ছে করে।

সব লক্ষ করেছে মধু। কত সহজেই না ললিত বিজলীর মন কেড়ে নিল। এমন কি সন্ধ্যার অন্ধকারে কবরখানায় সে দুজনকে হাত ধরাধরি করে বেড়াতেও দেখেছে। আজ সেও ঠিক অমনি করে বেড়াতে পারত। ওই তো মধুর দোষ, মুখ ফুটে মনের কথাটা কিছুতেই সে বলতে পারে না। তার কেমন যেন লজ্জা করে।

হঠাৎ ভারী জুতোর আওয়াজ শুনে মধুর ধ্যান ভেঙে গেল।

এই রে, সাহেব আবার এদিকে আসে কেন, বসন্ত তাড়াতাড়ি বিড়ি নিবিয়ে ফেলল।

একটু পরে সেখানে জি. এম. এল. দাস আণ্ডারটেকার অ্যাণ্ড এনগ্রেভার প্রতিষ্ঠানের কর্তা জর্জ মহেন্দ্রলাল দাস এসে দাঁড়োলেন। ওরা সকলে উঠে দাঁড়াল।

পাইপে দীর্ঘ টান মেরে জর্জ দাস বললেন, কাল সকালে অনেক নতুন অর্ডার আছে। যে কফিনগুলো এখনও শেষ হয় নি সেগুলো আজই শেষ করে দিতে হবে—

এখনও তিনটে কফিন বাকি সাহেব, বসন্ত বিড়বিড় করে উঠল।

রাত দশটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে তো? আর না হলে চলবে কেন—

আমরা মোটে চার জন লোক।

বাধা পেয়ে জর্জ দাসের মাথা হঠাৎ গরম হয়ে উঠল, না পার চাকরি ছেড়ে দাও। ওসব বুড়ো-হাবড়া দিয়ে আমার কাজ চলবে না।

কেউ আর একটি কথাও বলল না। বসন্ত মাথা নিচু করে রইল। বাইরে তখন বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ আরও বেড়ে উঠেছে।

দাস সাহেব আবার বললেন, যত রাতই হোক, হাতের বাকি কাজ শেষ না করে কেউ এখান থেকে বেরুতে পারবে না। কালকের মধ্যে পাঁচটা নতুন কফিন তৈরি করতে হবে। অর্ডার নেয়া হয়ে গেছে।

তাই হবে সাহেব, বসন্ত হাসবার চেষ্টা করল।

ঠিক হ্যায়, ভারী ভারী পা ফেলে গটগট করে দাস সাহেব চলে গেলেন।

সুখবরটা অন্য ঘরে সাহেব আগেই দিয়ে এসেছিলেন। তাই তিনি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জেমস আর জোসেফ এসে দাঁড়াল। মুশকিল, ঠিক এই কাজের সময় আবার এক সঙ্গে দুজনের অসুখ করেছে।

আমাদের কি ক্ষিধে তেষ্টা নেই নাকি? জেমস ফোঁস করে উঠল, এ হচ্ছে কি?

ওরে চুপ চুপ, ওরা যা বলে করে যা। মনে নেই কোথা থেকে কোথায় এসেছিস? খেতে না পেয়ে রাস্তায় মরে পড়ে থাকলেও কেউ দেখত না, পাদ্রী সাহেবের মুখ চেয়ে ক্ষিধেটা একটু চেপেই না হয় রাখলি বাবা—

কিন্তু আর তো পারি না, সকাল থেকে গাধার মতো খাটছি।

এই তো খাটবার বয়স, নিজের বুকে হাত রেখে বসন্ত বলল, আমার দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি? নে নে বাবা আয়, হাতুড়ি আর করাতটা নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দে।

তা না হয় দেব। কিন্তু এ আর পারব না। হাজার হোক মানুষ তো আমরা।

কিন্তু বুড়ো মানুষ তো নয়, আয় আয়—

কী আর করা যাবে, ঠক ঠকাঠক শব্দে ওরা কাজ আরম্ভ করে দেয়।

হাতে অসহ্য ব্যথা ধরে গেলেও বসন্ত কোনোদিনও বোধহয় স্পষ্ট প্রতিবাদ করবে না। সে-সব দুঃখের দিনের কথা কি ভোলা যায়। না, বসন্ত সে কথা কখনও ভুলবে না।

হাতুড়ি ঠুকতে ঠুকতে বসন্তর কেমন যেন নেশা ধরে যায়। আর একের পর এক ছেড়ে-আসা দিনগুলি ভিড় করে আসে তার চোখের সামনে। পাদ্রীসাহেবদের মনে মনে প্রণাম জানায় সে। হাত ধরে তারা যেন এদের সত্যিই অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে এসেছে।

সাধারণত বসন্তর বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায়।

বেলেঘাটার দিকে ছোট একটা বস্তি। সেখানে দুটো ঘরে তারা থাকে। বসন্ত, সরলা, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। সবসুদ্ধ তারা চারজন। এরা ছোট জাত তাই প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। একদিকে কোণঠাসা হয়ে এরা বাস করে।

ছোট জাত হলেও অভাব কিন্তু এদের ত্যাগ করে নি, বরং এদের ঘনিষ্ঠতা করে সঙ্গে বাসা বেঁধেছে। রাত্তিরে আধপেটা খেয়ে চারটি প্রাণী নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়ে।

সরলা অনুযোগ করে না, কিন্তু তার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বসন্তর বুক ভেঙে যায়।

বড় কষ্ট সরো, বড় দুঃখ !

কি হয়েছে গো ?

পয়সা নাই। ছুতোরের কেন পয়সা হয় না কে জানে ! সকাল থেকে রাত অবধি মাথার ঘাম তো পায়ে পড়ে যায়।

গরিবের কি পয়সা থাকে গো ?

হুঁঃ, বসন্ত হুঁকোতে টান দেয়।

এমনি করেই দিন কাটে। মাটির দেয়ালগুলোও যেন দিনে দিনে শুকিয়ে যায়।

কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে ছিটকে আসে এক ঝলক আলো। এরা আর আরও অনেকে ব্যাকুল আগ্রহে অন্ধকার থেকে আলোকে যাবার জন্যে দুই হাত বাড়িয়ে দিল।

সন্ধ্যের দিকে এরা রোজ আসতে লাগল। সাদা লম্বা কোট পরা এক সাহেব আর দুজন বাঙালী। তাদের হাতে ধর্মের বই, ছবি আর নানারকম খাবার। বস্তির ফাঁকা জায়গায় তাদের আসর বসে। এখানকার ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি প্রত্যেকেই ভিড় করে সেখানে।

সাহেব বেশ বাঙলা বলে। মেয়েরা শুনে খিলখিল করে হাসে।

সাহেব বলে, আমরা আসিয়াছি তোমাদের অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইবার জন্য। প্রভু যীশু তোমাদের দুঃখ বুঝিয়াছেন। তোমরা খাইতে পাও না, নানাবিধ কষ্টে কালাতিপাত কর। আমরা তোমাদের খাইতে দিব, সুখ দিব, শান্তি দিব। রাজার ধর্ম ও তোমাদের ধর্ম এক হইবে। আইস এক্ষণে আমরা প্রভু যীশুর ভজনা করি···তারপর চোখ বুজে বলে, ইহাদিগকে আলো দাও ইত্যাদি।

এক সময় সাহেব বলে, ফাদার মণ্ডল, এবার তুমি বল।

এইবার সাদা লম্বা কোট পরা বাঙালী ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ায়, চল সব যীশুর উপাসনা করবে। তোমাদের কোনো অভাব থাকবে না। চল সব—

আস্তে আস্তে বসন্ত ফাদার মণ্ডলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, কোথায় যেতে হবে বাবু? অনেক টাকা পাব তো? দু বেলা পেট ভরে খেতে পাব?

হ্যাঁ হ্যাঁ সব পাবে। ত্রাণকর্তা যীশু তোমাদের সব অভাব মোচন করবেন···এই আমাদের সঙ্গেই যেতে হবে!

কিন্তু এখানে আর ফিরব না বাবু। আমি যাব, আমার স্ত্রী যাবে আর ছেলেমেয়ে—তারাও যাবে বাবু। আমরা ছোট জাত কিন্তু—

প্রভু যীশুর কাছে সব সমান। বেশ তো, ফিরতে না চাও, থাকবে আমাদের সঙ্গে।

কবে যাব বাবু?

মন যখন চাইছে তখন আর দেরি নয়, যত শিগগির হয়।

শুরু হল নতুন জীবন।

পার্ক সার্কাসে যেখানে তারা এল সেটাও একটা বস্তি। প্রথমে ওরা বেশ হতাশ হয়েছিল কিন্তু নতুন জীবনের উন্মাদনায় সে হতাশা কিছু নয়।

বস্তির কাছেই বেশ বড় অফিস। বসন্ত সেই অফিসে কফিন তৈরির কাজ নিল।

প্রথমটায় সরলা খুব কান্নাকাটি করেছিল, ছি ছি শেষটা জাতকুল খোয়ালে?

গরিবের আবার জাতকুল!

বাপ-ঠাকুর্দার ধর্মটা কি ফেলনা নাকি গো?

চার।৫ক্ক আমার ধর্ম রে! হাতের জল চলে না, কেউ পোঁছে না।

তার চেয়ে এই বেশ, হ্যাঁ বাবু, আমার এই বেশ ভালো লাগে, পাদ্রী সাহেবরা বড় ভালো।

সরলার চোখ থেকে শুধু কয়েকটা ভারী ফোঁটা পড়েছিল।

সন্ধ্যেবেলা বস্তিতে তুমুল কোলাহল আরম্ভ হল।

ছুটে গেল সরলা আর বসন্ত। দৃশ্য দেখে সরলা শিউরে উঠল।

নতুন খ্রীষ্টান জগুর স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। ধর্ম পরিবর্তন করার চেয়ে এটাই বোধ হয় তার কাছে ভালো বলে মনে হয়েছে।

চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে জগু শুধু বলছে, আহা রে, সে কিছুতেই জাত খোয়াতে চায় নি, আমিই তাকে জোর করেছিলাম রে—

বাড়ি ফিরে সরলা বলল, আমিও অমনি গলায় দড়ি দেব।

ছি ছি, ও কি কথা!

কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে গেল। পাদ্রীদের অমায়িক ব্যবহারে স্বামী স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে একেবারে পাকা খ্রীষ্টান হয়ে উঠল। আরও অনেক নতুন খ্রীষ্টানের আগমন হল পাড়ায়। দেখতে দেখতে বস্তি ভরে উঠল।

সকাল বেলা উঠে ওরা সকলে প্রার্থনা করে এখন, পিতা ঈশ্বরের প্রেম, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সহভাগিতা ও শান্তি আমাদের উপর অনন্তকাল বর্ষিত হউক।

তারপর বাইবেল পড়ে, সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না।

বসন্ত কাজে বেরিয়ে যায়, সরলা ঘরে কাজ করে। বিজলী আর শ্যামুয়েল পাদ্রী মেমসাহেবের কাছে পড়তে চলে যায়।

বসন্ত ফেরে প্রায় একটার সময়। সরলা খাবার সাজিয়ে বসে

থাকে। খেয়েদেয়ে আবার বেরিয়ে যায়, সন্ধ্যেবেলা আবার ফিরে আসে।

দিন কাটতে লাগল।

আর এদের চেনা যাবে না। ছেড়ে-আসা অন্ধকার দিনের কথা মনে করে এরা লজ্জায় মুখ বাঁকায়। আজকাল স্বামী-স্ত্রীর আলাপ আবার নতুন করে জমে উঠেছে। সরলাও মানুষ হয়ে উঠেছে। জুতো পরে একা একা ঘন ঘন গির্জে যাচ্ছে। পাদ্রী মেমসাহেবের কাছে নাকি একটু একটু লেখাপড়াও শিখছে।

সরলা বসন্তকে একদিন জিজ্ঞেস করল, বল তো গট মানে কি ?

হেসে বসন্ত বলল, বাঃ, বেশ পড়ছ দেখি, গট মানে ভগবান, কেমন কি না ?

ছিঃ, ভগবান বলে না, গট মানে ঈশ্বর।

সরলার পরিবর্তন দেখে বসন্ত খুশী হল। তার দেহ আজ হঠাৎ-আসা লাবণ্যে ঝলমল করছে--যেন যীশুর আলোয় তার চোখ মুখ থেকে জ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে। সে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে আর কথাও বলতে শিখেছে বেশ।

সেদিন সরলাকে এক নতুন কাহিনী শোনাল।

তার স্বর বিস্ময় আর আনন্দে অদ্ভুত হয়ে উঠেছে, সরলা, এদের কবর দেয়া বড় ভালো।

কেন, কী হল ?

বাবা মারা যাবার দিনের কথা মনে আছে ? আমি এসে বলেছিলাম, আগুনে পুড়ে সব ছাই হয়ে গেল ?

হ্যাঁ মনে আছে। কিন্তু ওসব কথা আর কেন ?

না না ওসব কথা নয়, এদের কবর দেয়া আজ দেখলাম কিনা। আহা আমাদের মতো কাঁদায় না রে। কালো বড় বাক্সে ভরে সুন্দর করে এরা মাটির তলায় রেখে দেয়।

তাই নাকি গো?

হ্যাঁ, আমরা মরলেও তাই করবে। যাক বাবা, ঈশ্বর রক্ষে করলেন! উঃ পুড়িয়ে ফেলা কি ঝকমারি—বড় কষ্ট। কবরে বড় আরাম রে মালা, কবরে বড় সুখ!

হবেই তো, সরলা গর্বের হাসি হাসল।

বিকেল বেলা বসন্ত আজকাল প্রায়ই কবর দেয়া দেখে। কাচ দিয়ে ঘেরা কালো বড় মোটর গাড়িতে সে কফিন তুলে দেয়। তারপর কবরখানায় এসে পপরিদের সাহায্য করে কফিন নামাতে। কবরের কাছে দাঁড়িয়ে পাদ্রী প্রার্থনা করে। ব্যস, কবর খুঁড়ে পপরিরা কফিন নামিয়ে দেয়। বসন্তর গর্ব বেড়ে যায়—তার নিজের হাতের তৈরী কফিন।

মাঝে মাঝে কবরখানায় এসে কয়েক মুহূর্তের জন্যে বসন্ত বিমূঢ় হয়ে যায়। মার্বেল-বাঁধানো কবরের ধারে ধারে নানা রঙের অসংখ্য পাথরের কুচি হালকা রোদ্দুরে বহুমূল্য বিচিত্র রত্নসম্ভারের মতো জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। তার তাক লেগে যায়।

কাল রাত্রে পাতলা শিশিরের ছিটেয় ঘাস ভিজে গেছে, যেন সবুজ মখমলের আচ্ছাদন। বসন্ত অতশত বুঝতে পারে না। তার মনে হয়, এই মাটির তলায় প্রত্যেকে আছে, কত মেয়ে, কত ছেলে, কত গরিব আর কত বড়লোক!

সেখানে হয়তো গড়ে উঠেছে আর এক নতুন রাজ্য, যেখানে দুঃখ নেই, দারিদ্র্য নেই, মৃত্যু নেই!

ভোরবেলার প্রথম বাতাসের শব্দ আসছে। চারদিক নিস্তব্ধ। কেউ কোথাও নেই। কোন এক মহান সম্পদের ভারে সমস্ত ভূমিখণ্ড সুতীব্র অনুভূতিতে কাঁপছে। মাটির তলা থেকে হাজার হাজার মানুষ যেন বসন্তর কানে কানে বলে ওঠে, আছি, আছি, আমরা আছি!

আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে গড়গড় করে বসন্ত

বলে যায়, হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক, তোমার রাজ্য আইসুক······আমেন্!

আগাছা কাটার একটানা শব্দ আর পাখির কোলাহল ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

একটা কবরের গায়ে লেখা আছে।

সবার শেষে এসে তুই
মোদের আগে গেলি,
তাই তো শুধু থেকে থেকে
নয়ন-বারি ফেলি!

তারপর সে চলে আসে থামওলা বিরাট কবরটার সামনে। এটা কাবুলের লাট সাহেবের কবর। সেলাম করে বসন্ত। অহঙ্কারে বুক ভরে যায় তার। লাট সাহেবের সামনাসামনি সে দাঁড়িয়ে আছে। সেই প্রাচীর-ঘেরা নির্জন সীমানায় দাঁড়িয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে বসন্ত। তার মনে হয় সত্যি অন্ধকার থেকে সে আলোতে এসেছে।

কফিনের ডালা বন্ধ করবার শব্দে বসন্ত মাথা তুলল, কি রে মধু, হল?

হেসে মধু বলল, হ্যাঁ, আবার কি? জলও ধরে এসেছে, চল এবার উঠি—

দাঁড়া আর এক মিনিট, কয়েকটা পেরেক মেরে বসন্ত বলল, চল, ওঠ রে জোসেফ, ইস্ জেমসটার বড় বেশি ঢুলুনি এসেছে দেখছি—

হেসে জেমস বলল, ঢুলুনির আর দোষ কি দাদা, রাত তো কম হল না।

ভালো করে দরজায় তালা বন্ধ করে ওরা রাস্তায় নামল।

তারপর বিড়ি ধরিয়ে কাদা টপকে বাড়ির দিকে অগ্রসর হল।

লোয়ার সার্কুলার রোডের কবরখানার পাশ দিয়ে কয়েক মিনিট হেঁটে বসন্ত যখন তার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল তার একটু আগে জোড়া গির্জের ঘড়িতে এগারোটা বেজে গেছে।

বিজলী তখনও জেগে ছিল। শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল।

বলি ব্যাপার কি তোমার, অ্যাঁ?

বসন্ত বলল, কিছু না, একটু কাজ পড়েছিল।

এদিকে আমি ভাবনায় মরি—

কী হয়েছে বিজু?

সন্ধ্যে থেকে মা যা-তা বকছে। চোখের তারা বড় হয়ে যাচ্ছে। তাকে একা ফেলে তোমাকে খবর দিই কেমন করে! যা অন্ধকার, কাছাকাছি একটা লোকও নেই—কখন সাইরেন বাজে কে জানে! তুমি যা হয় ব্যবস্থা কর শিগগির—

তাড়াতাড়ি সরলার বিছানার কাছে চলে আসে বসন্ত, সরো, এই যে, আমি এসেছি। কি হয়েছে সরো?

কথার উত্তর দেয় না সরলা। চুপ করে শুয়ে থাকে। যেমন ছিল তেমন। সে বোধ হয় বুঝতে পারে না যে আর কেউ এসে বসেছে তার মাথার কাছে।

একটু পরে দেহটা নড়ে ওঠে সরলার, ওমা বিজু, তোর বাবাকে দেখিস। শুধু ডাল-ভাত খেতে দিবি না কখনও। আমি যাই—সে ওঠবার চেষ্টা করে।

ভয় পেয়ে বসন্ত বলে, কোথায় যাবে সরো?

প্রভু এসে গেছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, শিষ্যরা সকলেই সঙ্গে আছে। আহা, কী সুন্দর গাধা! আমি যাই—

কী দেখছ বাবা? জোরে কেঁদে ওঠে বিজলী, শিগগির যাও, কাউকে ডেকে আন—

বসন্ত উন্মাদের মতো সেই রাত্রে ছুটে যায় পাদ্রী সাহেবের কাছে।

বসন্তর বুকফাটা কান্নার আওয়াজে সে-রাত শেষ হল।

আর বিজলী যেন পাথর হয়ে গেছে। তার গভীর কালো চোখে আর-এক জগতের ঠিকানা। মুখে কথা নেই, চোখে এক ফোঁটা জল নেই।

তার পাশে দাঁড়িয়ে মধু। কিছুতেই সে কান্না চেপে রাখতে পারছে না। বস্তির অন্যান্য প্রতিবেশীও শোকে একেবারে বিহ্বল হয়ে গেছে। কিন্তু বিজলীর কি প্রাণ নেই! সকলে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ভাবছে, মেয়েটা কী!

বিকেল বেলা সরলার কবর হবার ঠিক আগে সেই কালো গাড়ি এসে দাঁড়াল। পাদ্রী সাহেব প্রার্থনা করতে এল। পাদ্রী মেমসাহেব মৃতার প্রসাধন করে দিয়েছে।

কালো গাড়ি দেখে অনেক সামলে উঠেছে বসন্ত। তারই হাতের তৈরি কফিন সরলাকে বহন করে নিয়ে যাবে। এ কি কম আনন্দের কথা!

প্রার্থনা হয়ে গেল। পপরিরা মৃতদেহ তুলতে যাবে এমন সময় বসন্ত বলল, রাখ, আর একটু রাখ, শেষবার দেখে নিই—

সেই জীর্ণ-দেয়াল-ঘেরা ঘরে অপরাহ্নের গৈরিক আলোয় স্থির দৃষ্টিতে কী দেখল বসন্ত?

সাদা কাপড়ের আচ্ছাদন। দীর্ঘ কালো চুল। চোখে নেমে এসেছে গভীর ঘুম। মুখে অল্প অল্প হাসি আর বুকে ছোট একটি বাইবেল······

সেই থেকে বসন্ত আর কফিন তৈরি করে না। লোকে বলে, স্ত্রী মারা যাবার পর তার মাথাটা নাকি একটু খারাপ হয়েছে।

আজকাল প্রায়ই স্ত্রীর কবরের পাশে বসে আপন মনে বুড়ো বসন্ত কী যেন বকে যায়। কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও উঠে দাঁড়িয়ে সরলার কবরের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। কবরখানায় যখন পড়ে থাকে তখন সেখানকার মালীর কাজই করুক—ব্যবস্থা করে দিল পাদ্রীসাহেব।

শুধু ঘর আর কবর, কবর আর সরলা!

মৃত্যুর পর সে যেন বসন্তর আরও কাছে এল। সরলা আছে তার নিজস্ব সীমানায়, শান্তিতে ঘুমোচ্ছে মাত্র কয়েক ফুট মাটির তলায়। বসন্ত আর শোক করে না, সে বিশ্বাস করে না সরলা নেই।

তার কবরের চারপাশে অনেক রঙের নানা ফুলের গাছ পুঁতল সে। মনে হয় সরলার মুখের সেই অল্প অল্প হাসি যেন মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। কবরের ধারে বসে মনের আনন্দে বসন্ত সরলার সঙ্গে কথা বলে। আর প্রবল উৎসাহে কবরের ঘাস পরিষ্কার করতে লেগে যায়। প্রত্যেকটি কবর যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের নীরব ভাষায় সে কী যেন বুঝতে পারে আর তার নিজেকে মনে হয় এ রাজ্যের অধীশ্বরের মতো। বসন্তর মন অহঙ্কারে ভরে যায়।

তবু আজকাল তার বড় বেশি পুরনো কথা মনে পড়ে। আর তার বুকে দীর্ঘনিশ্বাস ফুলে ওঠে। এই কবর খুঁড়ে আর কি সরলাকে টেনে তোলা যায় না?

হে ঈশ্বর, আদমের নাকে ফুঁ দিয়ে যেমন করে তুমি তাকে জীবন দিয়েছিলে তেমনি করে কি সরলার নাকে আর একবার ফুঁ দেবে না? শুধু একবার?

বাইবেলে লেখা আছে, তোমার যদি তিলমাত্র বিশ্বাস থাকে আর তুমি পর্বতকে বল, যাও সমুদ্রে পড়—তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা হইবে!

কবরখানায় বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বসন্ত

বলে ওঠে, আমার বিশ্বাস আছে, সত্যি বলছি প্রভু আমার বিশ্বাস আছে।

এমনি করে হঠাৎ তার ছাব্বিশ বছরের সঙ্গী তাকে ছেড়ে যাবে সে কথা বসন্ত ভাবতে পারে নি। শুধু মেয়েটাকে নিয়ে তার বড় ভাবনা হয়েছিল।

মা-মরা আঠারো বছরের মেয়ে বিজলী। আর কে তার দেখা-শোনা করবে! কিন্তু না, অল্প কয়েক দিনেই বসন্ত বুঝতে পেরেছে মায়ের সবকটি গুণই বিজলী পেয়েছে। সুন্দরভাবে সংসার গুছিয়ে, ঘরকন্নার কাজ নিপুণভাবে করে বিজলী সংসারের বিশৃঙ্খল ভাব এর মধ্যেই দূর করে দিয়েছে। এমন কি, বসন্ত বুঝতে পারে নি সরলা বেঁচে থাকলে সে আর কী করতে পারত। আজ সে ভাবে সরলা হয়তো সংসারের বেশি কাজ কোনোদিনই করত না, না হলে এত তাড়াতাড়ি বিজলী এমনভাবে গুছিয়ে নেবে কেমন করে!

বাবা, তোমার খাবার সময় হয়েছে, বাড়ি চল।

চমকে উঠে বসন্ত বলল, কটা বেজেছে?

কবরখানার সবচেয়ে বড় গাছটার দিকে তাকিয়ে বিজলী বলল, অনেক। চল, ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বাপের সঙ্গে এমনি দরকারী কথা ছাড়া বিজলী আজকাল বেশি কথা বলে না। বসন্তরও মেয়ের সঙ্গে বেশি কথা বলতে সাহস হয় না। দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে নিঃশব্দে বিজলীর হাত ধরে আস্তে আস্তে কবরখানা থেকে বেরিয়ে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

মাথার ওপর বর্ষার সূর্য হঠাৎ তখন বেশ প্রখর হয়ে উঠেছে।

পাদ্রী সাহেবের জরুরী চিঠি পেয়ে মাস দুয়েকের ছুটি নিয়ে শ্যামুয়েল এসে হাজির হল। পাছে দূর দেশে একা ভারী আঘাত সামলাতে না পারে বলে তাকে কোনো কথা লেখা হয় নি। বাড়ি

এসে খবর শুনে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। নিজে কাঁদতে কাঁদতে বসন্ত তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

চোখে গভীর দৃষ্টি নিয়ে বিজলী শ্যামুয়েলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। রোগা হয়ে গেছে তার ভাই, রঙ পুড়ে গেছে একেবারে।

ললিতেরও কি এত খারাপ চেহারা হয়েছে? শ্যামুয়েলের হাতে নিশ্চয়ই সে তাকে একটা বড় চিঠি দিয়েছে। কিছুদিনের ছুটি নিয়ে সেও তো এলে পারত শ্যামুয়েলের সঙ্গে।

রুদ্ধ অভিমানে বিজলীর বুক ভরে গেল। তবু তার মুখ দেখলেই বোঝা যায় বিপুল আগ্রহে ললিতের খবর জানবার জন্যে সে অপেক্ষা করছে।

এক সময় শ্যামুয়েল নিজেই কথা তোলে, ললিতও আর নেই বাবা, জানিস বিজু, চার-পাঁচদিন আগে ট্রাক থেকে পড়ে সেও মার কাছে চলে গেছে—

থরথর করে কেঁপে ওঠে বিজলীর শরীর। কিছু বুঝতে পারে না সে। বোবার মতো তাকিয়ে থাকে শ্যামুয়েলের মুখের দিকে।

আর বসন্ত? তার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেছে। মেয়ের মুখের দিকে সে তাকাতে পারে না।

শ্যামুয়েলের কান্না তখনও থামে না।

ছুটে এসে কবরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বসন্ত।

সরো, শ্যামুয়েল ফিরে এসেছে, তোমার শমু! সে কাঁদছিল, আমি তাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, ওরে কাঁদিস না শমু, কাঁদিস না। তোর মা মরে নি, ঘুমোচ্ছে। আমি তার সঙ্গে কথা বলি। কাঁদিস না রে, তোর মার ঘুম ভেঙে যাবে—

কিন্তু ললিত? তার সঙ্গে তো তোমার দেখা হয়েছে, না সরো? মেয়েটাকে কী বলি বল তো? সে যে আমার সঙ্গে একটা কথাও বলে না। আমি যে ললিতকে যুদ্ধে যাবার জন্যে জোর করেছিলাম।

স্বপ্নে দেখা দিয়ে মেয়েটাকে তুমি ভালো করে বুঝিয়ে বল সরলা—

হাওয়ায় ফুলগাছগুলো দোলে। পাতায় স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ শিশির। জলপাইএর পাতার মর্মরে আর ফুলের পাপড়িতে শুধু সরলারই বিচিত্র প্রকাশ।

বসন্ত সব ভুলে যায়।

বিজলীর চোখে যেন ঘোর লেগেছে।

সামনে কবরখানা। কিন্তু আকাশের দিকে তার চোখ। সেখানে কী দেখল বিজলী? আকাশের গা ঘেঁসে দীর্ঘ পথ চলে গেছে। অসংখ্য সাদা পায়রা উড়ছে। কাঁটার মুকুট পরে ওই মানবপুত্র আগে আগে যায়। আর আবছা গৈরিক আলোয় মানবপুত্রের পাশে পাশে সব চেয়ে সাদা পায়রা হয়ে ললিতের আত্মা—তাকে কি ভোলবার!

চারপাশে বাতাসের একটানা হাহাশ্বাস!

॥ তিন ॥

অবিশ্রান্ত একটানা বৃষ্টি পড়বার পর যথাসময়ে বর্ষাকাল এল। কিন্তু এখন আর আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই, সব সময় রোদের প্রখর স্পর্শে কবরখানার ঘাসগুলোও আনচান করে ওঠে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হবার আগে টিনের আয়না সামনে নিয়ে ভাঙা চিরুনি দিয়ে অনেকক্ষণ চুল আঁচড়ায় মধু। ললিত আর নেই। বিজলী এখন কেমন আছে কে জানে! অনেক দিন তার সঙ্গে মধু ইচ্ছে করেই দেখা করে নি। তার বিষণ্ণ মূর্তির কথা সে ভাবতে পারে না। কেঁদে শোক প্রকাশ করবার মেয়ে বিজলী নয়। তাই মধুর আরও বেশি ভয় হয়। সে ঠিক বুঝতে পারে না এত বড় আঘাত বিজলী কেমন করে গ্রহণ করবে। আর দেখা হলে মধুই বা কী কথা বলবে তাকে!

মধু বেরুতে যাবে এমন সময় হঠাৎ কোনো হিংস্র জানোয়ারের একটানা আর্তনাদের মতো সাইরেন বেজে ওঠে। ঘরে ঢোকে মধু। দরজা জানলা ক্লান্ত হাতে অনিচ্ছায় বন্ধ করে দেয়। চিৎকার করে মাকে ডাকে। ভয় পেয়ে ছুটে আসে ছেলের কাছে। রাস্তায় গোলমাল। সিভিক গার্ডদের হুইসেল। হুস হুস শব্দ করে দু-একটা মোটর গাড়ি বেরিয়ে যায়। ছেলেকে শক্ত করে ধরে কালীতারা ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপে।

ও বাবা মধু, হেই বোমা পড়ে। চাঁদ আছে বুঝি আকাশে—

ভয় নাই মা। কিছু হবে না। দু মিনিট পর অল ক্লিয়ার বাজিয়ে দেবে ঠিক।

দেয় দিক। আজ বাইরে যাওয়ার দরকার নাই তোর, বাঁধন আলগা হয়ে পড়ে বুড়ির। মৃত্যুভয়টাও কেটে যায় যেন।

মধু কথা বলে না। আর একবার সাইরেন বাজবার অপেক্ষায় দুই কান খাড়া করে থাকে। আজ বিজলীকে একবার দেখে আসতেই হবে। কিন্তু সে-কথাটা মার সামনে মুখ ফুটে বললেই মুশকিল। এক সুরে বকবক করতে আরম্ভ করবে কালীতারা।

কেন এমন করে সাইরেন বাজিয়ে মানুষকে এরা ভয় দেখায় মধু বুঝতে পারে না। এত সহজে বিপদের সম্ভাবনা দূর হয়ে যায় নাকি। মধু যা বলেছিল তাই হল। আবার সাইরেন বাজিয়ে কর্তারা বুঝিয়ে দিল ভয় নেই আর।

মধু উঠে দাঁড়ায় সঙ্গে সঙ্গে। শব্দ করে দরজা জানলা খুলে দেয়। কালীতারা কিন্তু ওঠে না। চুপ করে বসে ছেলের গতিবিধি লক্ষ করে। আজও ছেলে যদি বাইরে যায় তাহলে একটা কাণ্ড করবে সে।

কোথায় যাস? বলি ও মধু, জবাব দিলি না কেন কথার? কানের মাথা খেয়েছিস বুঝি—

বল না? শুনছি তো। চেঁচাও কেন শুধু শুধু?

চেঁচাই কি আর সাধে? যাস কোথায় তুই?

কাজ আছে।

উঃ—ছাই আছে। এই তো এলি খেটেখুটে। আমার সাথে দুদণ্ড কথা কইতে ইচ্ছা করে না তোর?

মধু হেসে বলে, কথা বলি না বুঝি? ঘুরে আসি থাম। খুব কথা বলব তোমার সাথে।

ঘুরে আসতে হবে না তোর। খিষ্টানদের সঙ্গে দিনরাত অত ঘোরাঘুরি কেন রে। কাজ নিলি ওদের সঙ্গে। তা না হয় দিস কাল

খারাপ, কাজ করবি কর, কথাটি কই না। কিন্তু ওই মেয়েটার সঙ্গে অত ভাব কেন তোর? আসা যাওয়া, জিনিস দেওয়া নেওয়া—ওরা যা খায় তুইও তাই খাস—এত কিসের রে?

এক সঙ্গে কাজ করলে ভাব তো হয়ই মা। মন্দ লোক ওরা নয়। কত উপকার করে আমার!

যাই করুক। খ্রিষ্টান বউ ঘরে আনবার ভাবনা যদি কখনও তুই করিস তাহলে আমি ডুবে মরব বলে দিলাম—

কী যে বল মা। এসব কথা কখনও কারুর সামনে তুল না। লজ্জায় মাথা কাটা যাবে আমার।

মাথা আমি কাটব ওই ছুঁড়ির। ফের ধেই-ধেই করে ডিম চাইতে এলে ঠ্যাং দুটো খোঁড়া করে দেব। লাজ নাই শরম নাই, পর পুরুষের সাথে ঢলাঢলি! বলি বাপের ওর চোখ নাই নাকি? কিছু দেখতে পায় না?

না, মায়ের ওপর রেগে যায় মধু। বিজলীর মতো মেয়ের সম্পর্কে এমন কর্কশ উক্তি তার ভালো লাগে না। কালীতারার দিকে না তাকিয়ে সে লম্বা লম্বা পা চালায় বসন্তর বাড়ির দিকে।

আয় আয়, মধুকে দেখে বসন্ত দুই হাত বাড়িয়ে দেয়, কত দিন তোকে দেখি নি যে, কোথায় ছিলি এত দিন?

বড় কাজ পড়েছিল দাদা। শরীরটাও তেমন ভালো ছিল না। তা তুমি ভালো আছ তো?

ভালো! আমার আবার ভালো থাকা! এখন সরলার কবরে যেতে পারলে হাড় জুড়োয়!

ছি ছি, সে কি কথা দাদা, মধু জিব কাটে, বিজলী আছে না? তাকে দেখবে কে?

সে কি আর সেই বিজু আছে রে মধু? ওরে, ললিত মরে আমার কী সর্বনাশটাই করে গেল রে!

ব্যস্ত হয়ে মধু জিজ্ঞেস করে, কেন, কী হল কী?

বিজু একটা কথাও বলে না, আমাকে গেরাহ্যি করে না, শমুর দিকে ফিরেও দেখে না, খাওয়া-দাওয়া তো ছেড়েই দিয়েছে মেয়েটা—

ওঃ ওই কথা? মধু হেসে বলে, তুমি কিচ্ছু ভেব না দাদা, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। কই কোথায় সে?

ওই উঠোনে বসে আছে দেখ গে।

আকাশে ম্লান ভাঙা চাঁদ উঠেছে। তারই ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে উঠোনে। একটু দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিজলী বসে আছে।

সেই আবছা আবছা অন্ধকারে তার মুখ দেখে মধু যেন চমকে গেল। এ কি, বিজলীর চোখ মুখ, তার সমস্ত দেহ যেন কেমন হয়ে গেছে! দেখে মনে হয় বুঝি প্রাণ নেই। মায়া হয় মধুর। আস্তে আস্তে সে তার পাশে এসে বসে।

সেই অকাল বর্ষা যেন বিজলীর সারা মন জুড়ে ঝরছিল। যদিও তার চোখ থেকে এক ফোঁটা জল ঝরে নি তবু সেই জলধারার বেগ তাকে যেন কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

সূর্যের প্রখর স্পর্শ গায়ে লাগবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল আবার সে যেন মানুষের পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। আর নতুন করে তার আর একবার মনে হল, ললিত নেই।

মধুর দিকে তাকিয়ে স্থির স্বরে বিজলী বলল, সব শুনেছ?

মধু ঘাড় নাড়ে, হ্যাঁ।

কী পাপ করেছি আমি? কেন এমন হল! আমার কী দোষ?

আহা হা, ওসব কথা বল কেন? আর ললিতের জন্যে অত দুঃখুই বা কেন, সে তো স্বর্গে গেছে।

সব বুঝি আমি। অত করে তখন বারণ করলাম! কত বার

বললাম, যেখানে মারামারি কাটাকাটি সেখানে সুখ নেই, সেখানে যেও না —যেও না। কে শোনে কথা!

দু-একটা কথায় মধু বুঝতে পারল বিজলী ললিতকে সহজে ভুলতে পারবে না। তার মুখ বড় বেশি বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। বসন্তকে জোর গলায় একটু আগে সে যে আশ্বাস দিয়েছিল, এখন বিজলীর কথা শুনে তার কাছে সেটা একেবারে মিথ্যা বলে মনে হল।

না না, কঠিন স্বরে বিজলী হঠাৎ বলে উঠল, এ বাড়িতে আমি আর থাকব না, আমি এখান থেকে চলে যাব।

সে কি? মধু বিচলিত হয়ে পড়ে, কোথায় যাবে?

পাদ্রি মেমসাহেবদের কাছে। তাদের সঙ্গে থেকে রুগীর সেবা করব, ঘুরে ঘুরে বেড়াব, কিছুতেই আমি আর এ বাড়িতে থাকব না।

আরে না না, তাহলে দাদাকে এই বুড়ো বয়সে দেখবে কে?

আমি তার কী জানি, আমার দিকে কেউ দেখেছিল? ওই তো মেরে ছাড়লে লোকটাকে! জোর করে যুদ্ধে পাঠাল—

আহা সে তো আর ইচ্ছে করে করে নি।

আমি কোনো কথা শুনব না। আমার যা খুশি তাই করব। আমি চলে যাব—ব্যস!

কিন্তু তাহলে তোমার সঙ্গে যে কারুর দেখাই হবে না—

না হয় না হোক। কে চায় দেখা করতে? যাকে সব দিয়েছিলাম তার সঙ্গেই-যখন আর দেখা হবে না তখন কী হবে আমার আর পাঁচজনের সঙ্গে দেখা করে? কেউ মরুক বাঁচুক তাতে আমার কী? আহা, লোকটাকে জোর করে মেরে ছাড়লে গো—

এতক্ষণ পর বিজলীর চোখ ঠেলে হু হু করে জল নামল।

এর জন্যে মধু একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সে যেন হঠাৎ আঘাত খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। বিজলীর শোক দেখে তারও

চোখ জলে ভরে উঠল। মনে হল, ললিত বেঁচে থাকলে আজ তাকে বিজলীর এ বুক-ভাঙা কান্না দেখতে হত না।

ছি ছি বিজলী, কোনোরকমে থেমে থেমে সে বলল, অমন করে কাঁদতে নেই, ললিতের আত্মা কষ্ট পাবে যে—

কী বললে? না না, আমি কেন তার আত্মাকে শুধু শুধু কষ্ট দেব? তার কি দোষ?

মধু আবার বলল, সে তো স্বর্গে গেছে, সুখে আছে। তার জন্যে কান্নাকাটি করতে নেই।

আর করব না। আমি জানি। তাই তো একবারও কাঁদি নি তার জন্যে। আজ হঠাৎ কী যে হয়ে গেল! আর কখনও কাঁদব না মধু। তুমি দেখে নিও।

এই তো কথার মতো কথা।

একরাশ বিস্ময়ভরা চোখ মেলে বিজলী বলল, স্বর্গে কোনো দুঃখ কষ্ট নেই, না?

আরে না না। সেখানে সব সময় আনন্দের হাট বসে আছে।

কেউ সেখানে মরে না। যে যাকে ভালোবাসে সে সমস্ত জীবন তার কাছে থাকে, না মধু?

হ্যাঁ।

আমি যাব সেখানে। কবে যাব?

ছি, ওকথা বলতে নেই।

কেন বলতে নেই? বা রে, ললিতকে দেখব না বুঝি?

আস্তে আস্তে সেখানে শুয়ে পড়ে বিজলী, বলল, স্বর্গরাজ্য তো আমাদেরই! ললিত আমায় ডেকে নাও! ললিত— ললিত—ললি—

প্রচণ্ড শব্দ করে একটা মিলিটারি ট্রাক আসছে। রাস্তা বড়

খারাপ। কখনও উঁচু কখনও নিচু। গাড়ি ভীষণ লাফাচ্ছে। হেড লাইটের তীব্র আলোয় চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

ললিত সামনে বসেছে। আরে, ও এখুনি পড়ে যাবে যে—

ললিত—ললিত—চিৎকার করে বিজলী উঠে বসে।

ঘাবড়ে যায় মধু, কী হল, অ্যাঁ?

উঃ, পড়ে গেল। গাড়িটা থামাতে পারল না—

কী বলছ বিজলী?

কে মধু? কই কিছু বলি নি তো! খারাপ স্বপ্ন দেখলাম কি না। ওঃ, কত দিন যে ভালো করে ঘুমোই নি। আর যে পারি না।

বিজলী আবার সেই দাওয়ায় শুয়ে পড়ে।

মধু উঠে গিয়ে ঘর থেকে একটা বালিশ এনে আস্তে আস্তে তার মাথার নিচে রেখে দেয়। তারপর একটু পরে খুব সাবধানে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। মধুর মনে হয়, বিজলী যেন একটি ছোট্ট মেয়ে আর সে তার চেয়ে অনেক—অনেক বড়!

চারপাশে আবছা আবছা অন্ধকার।

মায়ের মৃত্যুশোক ভুলতে খুব বেশি দেরি হয় না শ্যামুয়েলের।

কয়েকদিন সে বিষণ্ণ হয়ে বাড়িতে বসে থাকে। যুদ্ধের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর এ অবসর তার মন্দ লাগে না। যদিও সরলাকে সে ভালোবাসত খুব।

কিন্তু এর মধ্যে অনেককে চোখের সামনে মরতে দেখেছে শ্যামুয়েল। শত্রুর গুলি খেয়ে, গাড়ি চাপা পড়ে, নানারকম উৎকট রোগে ভুগে চিৎকার করতে করতে তার অনেক বন্ধুবান্ধব শেষ হয়ে গেছে। কাজেই শোকে কাহিল হয়ে বেশি দিন ঘরে বসে থাকবার পাত্র সে নয়। নেশা-টেশা না করে আর পারা

যাচ্ছে না। এমনি করে শুকনো মুখে দিন কাটালে আর তাকে কুচকাওয়াজ করতে যেতে হবে না। এই পচা গলির মধ্যে শুকিয়ে মরতে হবে। না পাবে একটা মেডেল, না পরবে একটা নতুন ব্যাজ।

কাজেই খুব অল্প দিনের মধ্যে শ্যামুয়েল সব দুঃখ কষ্ট ভুলে সোজা হয়ে চলাফেরা করতে লাগল। মদ খেয়ে হো হো হা হা করে অশ্লীল গান গেয়ে বস্তির মেয়েদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

তবে তাদের দিকে শ্যামুয়েলের বিশেষ নজর নেই। তার চোখ এখন আর একটু ওপরের দিকে। ব্যাগ হাতে জুতো পায়ে কোনো মেয়ে দেখলেই তার নেশা যেন বেড়ে যায়। নানা রকম ভঙ্গি করে সে অনেক দূর অবধি তাদের পেছন পেছন যায়।

বসন্ত এত কথা জানে না। বিজলীও এসব ব্যাপার বোধহয় লক্ষ করে না। কিন্তু মধু সমস্ত জানে। শ্যামুয়েলের এই চালচলন তার একেবারেই ভালো লাগে না। বড় বেশি বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। কোন দিন লোকটা কী বিপদে পড়বে কে জানে। হয় তো নেশার ঘোরে সাহেবের মেয়েদের টিটকিরি দিতে গিয়ে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। দাস সাহেব যেমন কড়া লোক, তিনি কি আর তাহলে ছেড়ে কথা বলবেন।

বিজলীর কথা আজকাল আরও বেশি করে ভাবে মধু। দুর্ভাবনায় তার ঘুম ছুটে গেছে। বিজলীর ভাবভঙ্গি দেখে সে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেছে। ললিত—ললিত করে মেয়েটা কি শেষটা পাগল হয়ে যাবে।

কফিন তৈরি করতে করতে মধুর আর হাত চলে না। জানলা দিয়ে আকাশের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে সে। বিজলীর সব দুঃখ সে যদি এক মুহূর্তে দূর করে দিতে পারত।

হেসে অ্যালবার্ট বলল, কি রে মধু, কার ধ্যান করিস রে, অ্যাঁ?

বিড়িটা কানে গুঁজে জোসেফ হাসে, এই ফাঁকে ক্রীশ্চান হয়ে যা, নইলে আবার কে এসে জুটে যাবে—

হ্যাঁরে, পাগলা বুড়োর খবর কি ?

আরে সে তো রাতদিন কবরখানায় মুখ গুঁজে পড়ে আছে। যা না মধু, এই বেলা দেখ, অ্যালবার্ট কাশে, আব কত বছর দিন গুনবি বাপু? তাই তোর কাজে মন নাই হেঁ হেঁ হেঁ—

থাম থাম, লজ্জা আর বিরক্তি মিশিয়ে মধু বলে, বাজে তামাশা ক'রো না।

ঠিক কথাই তো, বেন সায় দেয়, কাজে মধুর মন থাকবে কেমন করে? এমন সময় ওখানে বসে কত রসের কথা বলতে পারত, কি বলিস রে, অ্যাঁ?

কিন্তু সেখানে আবার শ্যামুয়েলও আছে যে, হাতুড়ি ঠুকতে ঠুকতে জেমস অসুবিধার কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে জোর গলায় হাসে।

আরে সে তো রাতদিন মদ খেয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। বাড়িতে আবার থাকে নাকি শ্যামুয়েল?

তাও তো বটে।

থাম থাম তোরা। আমার জন্যে তোদের অত মাথা ব্যথা কেন? মধু এবার জোরে জোরে করাত চালাতে থাকে।

সেই সময় হঠাৎ সেখানে শ্যামুয়েল এসে হাজির হল। তার চোখ দুটো লাল। খাঁকি প্যাণ্টের পকেটে হাত রেখে সে সোজা-সুজি বলল, কি রে, এখনও তোরা সেই রকম ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করিস?

আরে শ্যামুয়েল যে, একটা ভাঙা টুল এগিয়ে দিয়ে জোসেফ বলল, ব'সো ব'সো। হঠাৎ যুদ্ধ-ফেরত শ্যামুয়েলের পদমর্যাদা এদের কাছে অনেকখানি বেড়ে গেছে, তা কাজ না করে আর কী করি বল, আমরা তো আর তোমার মতো যুদ্ধ করতে পারি না—

কেন, পারিস না কেন? যুদ্ধ করলেই তো হয়। কে বারণ করেছে তোদের? সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে প্রত্যেককে এক একটা সিগ্রেট দিয়ে শ্যামুয়েল জিজ্ঞেস করল, এখন কত মাইনে পাস শুনি?

কত আবার, সেই বত্রিশ টাকা।

বলিস কী রে! চোখ বড় করে শ্যামুয়েল, আর ডিয়ার নেচ্ এলান্চ?

সেটা আবাব কী?

বলি যুদ্ধের জন্যে মাগগী-গণ্ডার বাজারে আরো কিছু টাকা বেশি পাস তো?

ঘোড়ার ডিম পাই, শুধু শুকনো বত্রিশ টাকা ভাই।

লোকের বাড়ি গিয়ে বাসন মাজ, সিগ্রেটের ছাই ঝেড়ে শ্যামুয়েল বলে, অনেক বেশি পাবি। গাধার দল কোথাকার!

খ্রীষ্টান চাকর রাখবে কে?

আর এ বয়সে বাড়ির চাকরি পোযাবে না ভাই।

তবে শুকিয়ে মর গাধার খাটুনি খেটে।

কি আর করি বল, হাতুড়িটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে অ্যালবার্ট বলল, প্রভুর যা ইচ্ছে তাই হবে—

আরে রাখ তোর প্রভু! আমার দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি, সুখে আছি বাবা। চল না, যুদ্ধে যাবি? আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব—

জেমস বলে উঠে, হ্যাঁ হ্যাঁ যাব। বেশি মাইনে পাব তো ভাই?

অনেক বেশি পাবি। তা ছাড়া খাবি দাবি আর কোট-প্যাণ্ট পরে ফুর্তি করে বেড়াবি—

আমিও যাব, জোসেফের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মধুর এসব কথা ভালো লাগছিল না। যুদ্ধে গিয়ে কী পরিবর্তন

হয়েছে শ্যামুয়েলের! আগে তো সে এমন ছিল না। আজ শ্যামুয়েলের এভাবে এখানে আসা তার ভালো লাগে নি। আর এসব কী বলছে সে!

প্রথমত, বিজলীর কাছ থেকে দূরে যেতে সে রাজি নয়। তারপর যুদ্ধে গেলে প্রাণ যাবার সম্ভাবনা। আর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে কী হবে? এরা খাবে কী। ছুদিনের জন্যে কোট-প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়িয়ে লাভটাই বা কী। যত বাজে কথা শ্যামুয়েলের!

এতক্ষণ পর মধুর মুখে কথা ফুটল, আর যুদ্ধ, থেমে গেলে? তখন কি করবি শ্যামুয়েল?

ওরে গাধা, তখন সরকার ডেকে চাকরি দেবে।

কিন্তু যদি যুদ্ধে গিয়ে মরে যাই?

তাহলে তো আপদ গেল। এখানে এইভাবে কুত্তার মতো মরার চেয়ে যুদ্ধে গিয়ে মরা অনেক ভালো। তাতে বাহাদুরি আছে, বুঝলি?

না বাপু, আমার অত বাহাদুরিতে দরকার নেই। এই বেশ ভালো।

চুলোয় যাক মধু, অন্য সকলে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, আমরা সবাই যুদ্ধে যাব, তুমি বন্দোবস্ত করে দাও শ্যামুয়েল।

এত লোকের যুদ্ধে যাবার কথায় শ্যামুয়েল হঠাৎ বেশ ঘাবড়ে গেল। সুবেদারের সামনে এ সব কথা তোলবার তার সাহস নেই। সব শুনে যদি রেগে-গিয়ে সুবেদার বলে ওঠে, চোপ রও উল্লু! তাহলেই তো হয়ে গেল। ইচ্ছে করে হাঙ্গামা ঘাড়ে নেবার দরকারই বা কী। চাকরির ভেতরকার কথা সে এদের জানাতে চায় না। এদের কাছে তাহলে তার চাল ভাবটা বজায় রাখা কঠিন হবে।

একটু ভেবে সিগ্রেটে দীর্ঘ টান মেরে শ্যামুয়েল বলল, শোন্, হঠাৎ দাস সাহেবকে চটানো ভালো দেখায় না। হাজার হলেও তার

পয়সা অনেকদিন খেয়েছি তো আমরা। তার চেয়ে এক কাজ কর তোরা—বল্ না মাইনে বাড়িয়ে দিতে—

মধু বাধা দিয়ে বলল, কে, বলবে কে শুনি?

তোরা সবাই মিলে বলবি?

তখন যদি লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয় আমাদের?

হুঁ, দিলেই হল আর কি, এই বাজারে লোক পাবে কোথায়? এই মাইনেতে কে কাজ করবে?

কত মিস্তিরি আছে--

হো হো করে হেসে শ্যামুয়েল বলল, যাক না তাদের কাছে। তাদের দর শুনলে মজা টের পাবে খন। আর যদি মাইনে বাড়িয়ে না দেয়, তোরা কাজ করবি না। রাতারাতি কফিন তৈরি করতে হয়, সাহেব বাপ বাপ বলে মাইনে বাড়িয়ে দেবে দেখিস—

মধু ধমক দিয়ে বলল, তুই থাম শ্যামুয়েল, শয়তানি শেখাস না। বলি তখনও সাহেব যদি মাইনে বাড়িয়ে না দিয়ে তাড়িয়ে দেয় তাহলে কি আমরা না খেয়ে মরব?

তখন আমি আছি। সব যুদ্ধে যাবি।

ম্যানেজার ভুবনবাবুকে আসতে দেখে শ্যামুয়েল উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল।

ভালো আছ তো শ্যামুয়েল?

হ্যাঁ বাবু। আপনি কেমন?

আমি! শ্যামুয়েলের ছেড়ে দেয়া টুলটায় বসে পড়ে ভুবনবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

শুকনো শীর্ণ চেহারা। জীর্ণ কোট। অপরিচ্ছন্ন ধুতি। শরীরে দারিদ্র্যের ছাপ।

সবই করতে হয় ভুবনবাবুকে। কফিনের মাপ নেয়া থেকে আরম্ভ করে সেকেণ্ড ক্লাশ ট্র্যামে কাঠের গোলায় ছুটোছুটি পর্যন্ত। আর দিনরাত দাস সাহেবের হুমকি তো আছেই। তবে ভুবন

বাবুর চামড়া আজকাল বেশ শক্ত হয়ে গেছে, কিছুই আর গায়ে লাগে না তার। শুধু অভাব বড় বেশি বেঁধে।

আমার কথা বাদ দে শ্যামুয়েল। শরীর বড় খারাপ। অনেকক্ষণ ধরে কাশে ভুবনবাবু, বড় আশা নিয়ে ক্রীশ্চান হয়েছিলাম রে, এখন না পোঁছে হিন্দুরা, আর এরা তো রাজা করে দিয়েছে!

যুদ্ধে চলুন আমাদের সঙ্গে?

সে কী রে?

হেসে মধু বলল, মাইনে না বাড়ালে এরা কেউ আর এখানে কাজ করবে না। শ্যামুয়েলের সঙ্গে যুদ্ধে যাবে।

ভালোই তো, ম্লান হেসে ভুবনবাবু বলল, আমার কি ওসব পোষায় রে? শরীরের যা অবস্থা, চলতেই পারি না তো বন্দুক ঘাড়ে!

সকলে হেসে ওঠে।

হ্যাঁরে শ্যামুয়েল, ভুবনবাবু বলে, তোর তো আজকাল অনেক পয়সা। দে না দুটো টাকা ধার, কিছু ওষুধ কিনে নিয়ে যাই?

নিশ্চয়ই, পকেট থেকে টাকা বের করে শ্যামুয়েল, এই এই যে বাবু। অনেক নিয়েছি আপনাদের কাছ থেকে—

আমরা কে? সব সেই প্রভুরই দান, আস্তে আস্তে ভুবনবাবু সে-ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আর একটা সিগ্রেট ধরায় শ্যামুয়েল, লোকটা সত্যি ভালো রে, ওর জন্যে কষ্ট হয়।

হ্যাঁ, লেখাপড়া শিখেও এই অবস্থা।

আচ্ছা আমি সরে পড়ি এখন, একটু নেশা করি গে যাই। তোরা কী করবি আমাকে জানাস, সব ঠিক হয়ে যাবে, গুনগুন করতে করতে শ্যামুয়েল চলে গেল।

ছটা বাজতে যখন আর একটু বাকি, এরা প্রত্যেকে উঠি-উঠি

করছে, এমন সময় ভুবনবাবু ফিরে এসে জানাল, সাহেব এখুনি প্রত্যেককে তলব করেছেন।

সর্বনাশ! মধুর কপাল ঘেমে ওঠে, রাতে কাজ করতে হবে নাকি? কপালটাই খারাপ আমার।

আর বেশিদিন তো নয় বাবা, যুদ্ধে যাবার নেশায় জোসেফ তখন খেপে উঠেছে, চল, কি বলে শুনে আসি। এতদিন যখন করলাম তখন আর দু-একদিন কষ্ট করতে দোষ কী!

ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে মুখের পাইপটা আরও জোরে চেপে ধরে জর্জ মহেন্দ্রলাল দাস একটা কঠিন ভ্রুকুটি করলেন। তারপর আরও কঠিন চোখে প্রত্যেকের দিকে একবার তাকালেন।

বুড়ো বসন্তর ছেলেটা কি বলে গেছে তোমাদের?

ঘরের মাঝখানে যেন বাজ পড়ল। সাহেবের সে-চেহারা দেখে প্রত্যেকের যুদ্ধ করবার সাধ উড়ে গেল। তবু মধু জানে, শ্যামুয়েল যখন আছে তখন এ চাকরি গেলেও ক্ষতি নেই, যুদ্ধে যাবার রাস্তা তো খোলাই আছে! আর বসন্তকে দাস সাহেবের 'বুড়ো' সম্বোধন আজ খুব খারাপ লাগল মধুর।

চুপ করে কেন? আবার গর্জন করে ওঠেন দাস সাহেব, বল, কী বলে গেছে সেই রাস্কেল?

না, বলবে আর কী, বলেছে আমরা ইচ্ছে করলে যুদ্ধে যেতে পারি—

তাই যাও না তবে, এখানে পড়ে আছ কেন? ভালো মিস্তিরি নিয়ে আসি আমি। দূর হয়ে যাও সব। যখন কেউ পুঁছত না তখন চাকরি দিয়ে মানুষ করলাম—এখন মুখে সব বড় বড় কথা!

আমরা কি করব সাহেব, ঢোঁক গিলে জেমস বলল, আমাদের বলল যে। আপনি মাপ করুন সাহেব!

ঠিক হ্যায়, গম্ভীর মুখে দাস সাহেব বললেন, আর যেন কখনও এসব কথা না শুনি—যাও সব!

দাস সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। একটু পরে তাঁর গাড়ির আওয়াজ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

রাস্তায় নেমেই আর সকলের সামনে ভুবনবাবুকে মধু বলল, এটা কি করলেন ম্যানেজার বাবু? গরিবের নামে লাগিয়ে ওর কাছ থেকে কি আপনি আট আনাও বেশি পাবেন?

লজ্জা পেয়ে ভুবনবাবু মধুর একটা হাত চেপে ধরে বলল, ওরে, সাহেব আমাকে খুঁচিয়ে সব জেনে নিলে। বললে, আমার মাইনে অনেক বাড়িয়ে দেবে। আর লোকটা কী মিথ্যাবাদী! বলেছিল, তোদের কাউকে একথা বলবে না। বিশ্বাস কর্ মধু, আমি নিজের থেকে ইচ্ছে করে কিছু বলি নি।

কারুর মুখে আর কোনো কথা নেই। প্রত্যেকে চুপ করে পথ চলতে থাকে।

সন্ধ্যেবেলা ঘোর মাতাল অবস্থায় মধুর বাড়িতে শ্যামুয়েল এসে হাজির, কী রে, কী হল?

খুব হয়েছে শ্যামুয়েল, ওসব বাহাদুরি ওখানে গিয়ে আর ক'রো না।

কী—কী বললি? সেই প্রমত্ত অবস্থাতেও শ্যামুয়েল প্রত্যেকটি কথা বুঝতে পেরে বলল, বেটাকে বন্দুকের বাড়ি মেরে মাথার ঘিলু বের করে দেব। না বাবা, হুঁ হুঁ গুলি করব না, তাহলে আবার সুবেদারের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে, মাদুরে শুয়ে পড়ে শ্যামুয়েল।

শ্যামুয়েল—

আর কোনো কথা শ্যামুয়েলের কানে যায় না। মধুর মাতুরের ওপর মদের ঘোরে সে তখন একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

যদিও কালীতারা এখন বাড়িতে নেই তবুও ভয়ে ভয়ে মধু বারবার পিছন ফিরে তাকায়।

পরদিন খুব ব্যস্ত হয়ে ফাদার হোমস্ কবরখানায় বসন্তর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁকে দেখে আনন্দে কাছে ছুটে এল বসন্ত, আসুন ফাদার, আসুন!

প্রভু তোমার মঙ্গল করুন, টুপি খুলে ফাদার হোমস্ বললেন, তোমার কাছে বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়াছি বসন্ত, আইস নির্জনে বসা যাউক—

চলুন ফাদার, চলুন, সরলার কবরের কাছে এসে বসন্ত বলল, আমাকে ডেকে পাঠালেই তো হত সাহেব। আপনি কষ্ট করে এলেন কেন? তা দরকারটা কী ফাদার?

কোনো ভূমিকা না করে ফাদার বললেন, শ্যামুয়েল বখিয়া যাইতেছে, অবিলম্বে তাহার বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন—

সে কী ফাদার, অবাক হয়ে যায় বসন্ত, এই সেদিন সরলা চলে গেল, লোকে বলবে কী?

আমি বলিতেছি, কেহ কিছু বলিবে না। কারণ বিবাহ না দেয়া এক্ষণে তাহার পক্ষে ক্ষতিকর। মঙ্গল বা কল্যাণের জন্য নিয়ম ভঙ্গ করিলে পাপ হয় না। সুতরাং তাহার বিবাহের আয়োজন ত্বরায় করিতে হইবে।

কার সঙ্গে বিয়ে দেব ফাদার?

যত্ন গোমেজের কন্যাটির সহিত। সে বেশ সুন্দরী আছে। শ্যামুয়েলের সহিত আমার কথা হইয়া গিয়াছে, কন্যাটিকে পাইলে অদ্যই সে বিবাহ করিতে রাজি আছে।

তাই নাকি ফাদার? শমু বিয়ে করতে চায়? খুব ভালো, সাহেব, আমি ব্যবস্থা করব—

হ্যাঁ। বিবাহ এখন শ্যামুয়েলের একমাত্র ঔষধ। সে যে কেবলমাত্র বখিয়া যাইতেছে তাহা নয়, আরও নানাপ্রকার পাপ-কাজে এক্ষণে লিপ্ত আছে। অদ্য দাস সাহেব আমাকে বলিলেন, সে নাকি তাঁহার কর্মচারীদের ভাংচি দিতেছে। দাস সাহেব তোমার উপরও এ জন্য ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। যাহা হউক, আমি সব ঠিক করিয়া দিয়াছি। শ্যামুয়েলকে বুঝাইয়াছি, জনে জনে কর্মচারীদের বলিয়াছি যে মনিবের ক্ষতি করা মহাপাপ। এমন করিলে প্রভু অসন্তুষ্ট হইবেন।

আমি কিছুই জানি না ফাদার।

কিছু জানিবার আর প্রয়োজন নাই। সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে বিবাহ ঠিক রহিল। শীঘ্র এনগেজমেন্টের বন্দোবস্ত করিতেছি—

হ্যাঁ হ্যাঁ ফাদার, আপনারা মা বাপ, যা ভালো বোঝেন তাই করুন!

উত্তম! আমি এখন বিদায় লইতেছি, যথাসময় পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে—

নমস্কার ফাদার!

হ্যাঁ হ্যাঁ নমস্কার—নমস্কার, তোমার সহিত আলাপ করিয়া বড়ই পুলকিত হইলাম।

তিনি বেরিয়ে গেলেন।

আনন্দে সরলার কবরের ওপর বসন্ত ঝাঁপিয়ে পড়ল, সব শুনলে তো সরো? তোমার শমুর বিয়ে হবে—তোমার ঘরে নতুন বউ আসবে—

জলপাই গাছ থেকে হঠাৎ সিরসির শব্দ ভেসে আসে আর অসংখ্য পাতা ঝরে পড়ে কবরের ওপর।

এই তো সরো, উচ্ছ্বসিত হয়ে বসন্ত আবার বলে উঠে, তুমিও তাহলে খুশি হলে। আমি জানি যত্ন গোমেজের মেয়েকে তোমারও খুব পছন্দ—

কয়েক ফুট মাটির ব্যবধান যেন ঘুচে যাচ্ছে। বসন্তর গায়ে এসে লাগছে সরলার মৃদু নিশ্বাস। উৎসুক চোখে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সরলাকে—

সাদা কাপড়ের আচ্ছাদন। দীর্ঘ কালো চুল। চোখে নেমে এসেছে গভীর ঘুম। মুখে অল্প অল্প হাসি আর বুকে ছোট একটি বাইবেল……

দিগন্তে সূর্যাস্তের আকাশ-ঢালা লাল রঙ!

।। চার ।।

এখন বর্ষা নেই। চারপাশে শরতের রঙ ধরেছে। বিজলীর হঠাৎ সব কিছুকেই বিচিত্র মনে হল। মাথার ওপর ভরা আকাশ। সব দিকে যেন মহা জীবনের ব্যাপক সঙ্কেত। রহস্যঘন প্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিজলীর মনের অনেক বন্ধ দরজা একে একে খুলে গেল।

বস্তুত এতদিন একটা ব্যক্তিগত অন্ধ স্বার্থপরতা তার সমস্ত মন সংকীর্ণ করে রেখেছিল। কাউকে তার ভালো লাগত না, কাউকে সে সহ্য করতে পারত না। মনে হত এই পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ যেন ইচ্ছে করে তার সর্বনাশ ডেকে এনেছে। কিন্তু আজ বুকজোড়া খোলা হাওয়ায় প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিয়ে, উজ্জ্বল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আর অবারিত স্বচ্ছ আলোর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে সংকীর্ণতার তুচ্ছ বেড়া মুহূর্তে ভেঙে পড়ল।

আবার সকলকে তার ভালো লাগল। বসন্তর জন্যে দুঃখ হল। মধুর কথা মনে পড়ল। শ্যামুয়েলের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করল। আর বাড়িতে কয়েক দিন ধরে যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে, এতদিন বিজলী তা নিয়ে মেতে উঠতে পারে নি। আজ সেকথা ভেবে তারও আনন্দ হল। তার দাদার বউ আসবে যে— শ্যামুয়েলের বউ।

সব ঠিক হয়ে গেছে।

বিকেলে গির্জেঘরে সকলেই উপস্থিত হল। অ্যালবার্ট, মধু,

বেন, জোসেফ, জেমস—আরও অনেকে। প্রত্যেকেই ভালো সাজ-পোশাক করেছে, মুখে পান ভরেছে, কেউ কথায় কথায় বেশ জোরে হেসে উঠছে, কারুর কানে বিড়ি গোঁজা।

বেন বলল, যদু গোমেজের বেটি তো বেশ রে!

বউএর দিকে তাকিয়ে জোসেফ বলে, ওদিকে অমন করে তাকাস না বেন, শ্যামুয়েল মাথা ফাটিয়ে দেবে। ওঃ, কেমন ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছে দেখ।

হাসবে না? এই তো হাসির সময়।

এসব কথা মধুর কানে যায় না। চুপ করে মুগ্ধ বিস্ময়ে সে শুধু বিজলীর দিকে তাকিয়ে থাকে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে আজ তাকে!

পুলপিঠের ওপরেও ভিড় জমেছে। একদিকে দাঁড়িয়েছে যদু গোমেজ আর তার মেয়ে রেণু আর কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। ফুলের অলঙ্কারে তাদের অঙ্গ ভরে গেছে! আর এক দিকে বুড়ো বসন্ত, শ্যামুয়েল, বিজলী আর পাড়ার কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। চারপাশে অজস্র ফুলের গন্ধ।

ফাদার ব্যানার্জি বিয়ে দিচ্ছেন।

বল শ্যামুয়েল, আজ হইতে এই বালিকাটিকে আমি আমার ধর্মপত্নী রূপে গ্রহণ করিলাম—

শ্যামুয়েল গড়গড় করে বলে যায়।

ফাদার ব্যানার্জি আবার বললেন, বল রেণু, আজ হইতে এই বালকটিকে আমি আমার ধর্মপতি রূপে গ্রহণ করিলাম—

রেণু ফিসফিস করে কী বলল শোনা গেল না।

আংটি বদল হয়ে গেল।

এইবার ফাদার ব্যানার্জি লম্বা প্রার্থনা আরম্ভ করলেন। এই নবদম্পতির সমস্ত ভার সেই মঙ্গলময়ের ওপর তুলে দেয়া হল।

এবার গানের পালা। ফাদার প্রথম পদ গেয়ে শুরু করে

দেন। সকলে সমস্বরে তাল মেলায়, দুইটি হৃদয় ভাসাল তরণী, কাণ্ডারী তুমি প্রভু গো—।

অনুষ্ঠান চুকতে বেশি দেরি হল না। গির্জের উঠোনে খাওয়া-দাওয়ার সামান্য আয়োজন করা হয়েছে। বড় তাড়াতাড়ি—অন্ধকার হবার আগেই সব সেরে ফেলতে হবে। ব্ল্যাক আউটের হাঙ্গামা আছে কিনা।

হৈ হৈ করতে করতে প্রত্যেকে নবদম্পতিকে ঘিরে গির্জেঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে এল। শুধু বসন্তর মুখ বড় করুণ দেখাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে পুলপিঠের ওপর সরলা যেন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। দু হাত তুলে সে এদের আশার্বাদ করে গেল। তার গলার চাপা স্বর বসন্ত স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে।

আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে দিয়ে সময় কাটতে থাকে। প্রচুর উৎসাহে মধু আর বিজলী নিমকি সিঙাড়া পরিবেশন করে। তারপর ভাঁড়ে করে চা দেয়া হবে।

শ্যামুয়েলের হাসি আর থামে না। রেণুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সে শুধু হেসেই যাচ্ছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হবার আগেই সমস্ত হাঙ্গামা চুকে গেল। ভিড় কমে গেল দেখতে দেখতে। সাদা বিরাট ইউক্যালিপটাস গাছের চারপাশ ঘিরে প্রথম শরতের হালকা অন্ধকার নামল। কোথা থেকে একটানা রিমঝিম শব্দ ভেসে আসছে। পরিপূর্ণতায় সবদিক যেন গভীর হয়ে উঠেছে।

এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ সেই গাছের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ এক সময় বিজলীর সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এল। কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে—সে যেন তার হাত ধরে এখুনি কোথায় নিয়ে যাবে। আবেশে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিজলী তার হাত বাড়িয়ে দিল।

আঃ—খুব শক্ত করে সে তার হাত চেপে ধরেছে। এবার নিয়ে যাক না যেখানে খুশি!

সবাই চলে গেছে! অন্ধকার হয়ে গেল। বাড়ি যাবে না

চোখ তুলে বিজলী বলে, চল।

তখনও মধু শক্ত করে তার হাত ধরে আছে। আস্তে আস্তে বিজলী হাত ছাড়িয়ে নেয়।

বিয়ের পর শ্যামুয়েলের দেখা পাওয়া মুশকিল হল। ঘর থেকে সে বার হয় না। যতক্ষণ ঘরে থাকে ততক্ষণ সমস্ত দরজা জানলা বেশ ভালো করে বন্ধ করে রাখে।

সেই বন্ধ ঘরের দিকে তাকিয়ে বিজলী মাঝে মাঝে ভাবে, কেমন করে সারা দিন রাত ওরা বন্ধ ঘরে বসে থাকতে পারে। দম বন্ধ হয়ে যায় না ওদের!

বসন্ত খুশিতে ছটফট করে। যাক, তাহলে ওরা সুখী হয়েছে।

ঘরের দরজা বন্ধ করে স্বর্গে বাস করলেও মর্ত্যভূমির ডাক আসে একদিন। শ্যামুয়েলকে এবার কর্মস্থলে ফিরে যেতে হবে। ছুটি ফুরিয়ে গেছে। তার মুখে বেদনার ছায়া নামে আর বিজলী রেণুর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুনতে পায় অনেকবার। আহা সবাই সুখী হোক, বিজলী মনে মনে বলে, কেন এত দুঃখ পায় লোকে!

কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে কী যেন হয়ে যায়। রাস্তায় গোলমাল হৈ চৈ। গান্ধী-টুপি-পরা স্বদেশী ছেলেরা নাকি ট্রাক পুড়িয়ে সাহেবদের মেরে ধরে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। কোট-প্যাণ্ট পরে রাস্তায় বার হলেই মার খেতে হবে।

এ আবার কী হল। একে যুদ্ধ, তার ওপর আবার এই কাণ্ড—বসন্তর মাথা ঘুরে গেল। শান্তির জন্যে, তাদের নিরাপত্তার

জন্যে পাদ্রীসাহেব গির্জেয় বসে ঘন ঘন প্রার্থনা করতে লাগল। শ্যামুয়েল কিন্তু আনন্দে মেতে উঠল। এই সুযোগে যদি আর কিছুদিন থেকে যাওয়া যায়।

কিন্তু তা হল না। পরদিন সকালবেলা একটা মিলিটারি ট্রাক এসে তাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। কী একটা বিশেষ দরকারে তাকে এখুনি কলকাতার অফিসে যেতে হবে। তারপর কাল ফিরে যেতে হবে কর্মস্থলে। বিষণ্ণ মুখে শ্যামুয়েল সাজ-পোশাক করে নেয়।

বিজলী এসে বলে, আজ বেরিও না দাদা, রাস্তায় বড় গোলমাল।

বীরত্ব জাহির করবার এ সুযোগ শ্যামুয়েল ছাড়ে না। কেননা যেতে তাকে হবেই। না গিয়ে উপায় নেই।

সে হেসে বলে, কেন বল দেখি?

তুমিও প্যাণ্ট পরে যাচ্ছ কি না, যদি ওরা মারে?

শ্যামুয়েল বুটের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলে, আমাদের গায়ে একটু আঁচড় কাটতে পারে এমন কেউ এখনও জন্মায় নি রে বিজু, দেখে আয় না কত বন্দুক আছে গাড়িতে!

রেণুর ছলোছলো চোখের দিকে তাকিয়ে একান্ত অনিচ্ছায় শ্যামুয়েল ট্রাকে চড়ে চলে যায়। যাবার আগে তার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে, অফিসের কাজ হয়ে গেলেই খুব তাড়াতাড়ি যেমন করে পারে সে বাড়ি ফিরে আসবে।

শ্যামুয়েলের ভয় কী। রেণুকে পেয়ে সে আর কিছু গ্রাহ্য করে না। চলুক যুদ্ধ, হোক অগস্ট আন্দোলন। যুদ্ধ না থাকলে খেত কী শ্যামুয়েল? এমন চাকরি কোথায় হত তার? বত্রিশ টাকা মাইনের মিস্ত্রিরী হয়ে কোনো রকমে দিন চালানো তার মতো লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। রেণুকে তাহলে সে বিলিতি এসেন্স কিনে দিত কেমন করে?

আরও কত কী তাকে কিনতে হয় বউএর জন্যে। আর ছেলে হলেই তো খরচ আরও বাড়বে। যেতে যেতে ভাবে শ্যামুয়েল, যত গোলমাল বাধে তার পক্ষে ততই মঙ্গল। চাকরি বেশিদিন টিকবে। তাই বাধুক যত গণ্ডগোল!

কিন্তু সন্ধ্যের একটু আগে শ্যামুয়েল যখন ফিরে এল তখন তার অবস্থা দেখে বাড়ির সকলে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। চিৎকার করে কেঁদে উঠল রেণু। শ্যামুয়েলের কাপড়ে তাজা রক্তের দাগ, হাতে আর মাথায় পুরু ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

কী হল দাদা? তার হাত ধরে বিজলী বলল, অত করে তখন বললাম আজ বেরিও না, বেরিও না—

থাম থাম, রাগে শ্যামুয়েলের চোখ দুটো জ্বলে উঠল, ছেলেগুলোর সাহস কম নয়, আমাদের ঘাঁটানো! স্বদেশী করা বের করে দিয়েছি একেবারে—

কী হয়েছিল শমু? বিস্মিত হয়ে বসন্ত জিজ্ঞেস করে।

আরে ছেলেগুলো দলে দলে এসে আমাদের গাড়ি আটকাল। বলে, পুড়িয়ে দেবে। আমি বললাম, পোড়াবে মানে? তোমাদের বাবার ট্রাক? অমনি ওরা বড় বড় থান ইট ছুঁড়ে আমার মাথা ফাটিয়ে দিল। সেদিনকার সব পুচকে ছোঁড়া, নাক টিপলে দুধ বেরোয়, ইট-পাটকেল নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে আমাদের সঙ্গে।

তারপর—তারপর কী হল দাদা?

তারপর আর কী, গুড়ুম গুড়ুম গুলি চলল। আরে বাপু পালা, তা নয়, যতই গুলি চলে, ছেলেগুলো ততই এগিয়ে এসে ধপাস ধপাস করে পড়ে মরতে লাগল। এমনি করে মরে ভূত হয়ে তোরা স্বদেশী করবি—হুঁ! যত সব পুচকে গোঁয়ার ছেলের দল! মর্ মর্। আমাদের আর কী, আমি তো ফাঁকতালে আরও সাত দিনের ছুটি বাগিয়ে নিলাম এই পট্টি দেখিয়ে—

তোমার বেশি লাগে নি তো দাদা ?

তা লেগেছিল বই কি একটু। কিন্তু ওতে আমাদের কী হয়। আমাদের কারবার গুলি গোলা কামান নিয়ে। নেটিবদের ইট পাটকেল আমাদের কী করবে। এক রাউণ্ড গুলি চালালে সব সাফ হয়ে যাবে। করুক না স্বদেশী যত পারে।

বিজলীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। চারপাশে শুধু মারামারি আর কাটাকাটি। শান্তি কি কোনোদিনও হবে না! আজ গুলি খেয়ে কত ছোট ছোট ছেলে মরেছে। বিজলীর হঠাৎ নিজেকে মনে হল তাদের মায়ের মতো আর তার বুকের ভেতর টনটন করে উঠল।

এস রেণু, শ্যামুয়েল তার হাত ধরে সটান ঘরে গিয়ে খিল দিল।

বাড়ির সকলের সামনে হঠাৎ এই অভ্যর্থনায় লজ্জায় যেন মরে গেল রেণু। কিন্তু লোকজন দেখতে গেলে শ্যামুয়েলের চলবে না। আর সাত দিন মাত্র তার সময়। তারপর কতদিনের জন্যে কোথায় যেতে হবে, আবার কবে রেণুর সঙ্গে দেখা হবে কে জানে।

ঠিক সাত দিনের দিন বিষণ্ণ শ্যামুয়েল চলে গেল। আর আছড়ে পড়ে রেণুর সে কী কান্না! ঘরের দেয়ালে যেন নিরানন্দের ছায়া নামল।

বিজলীর বার বার ইচ্ছে করছিল তার ভাইকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলে, যেও না যেও না, যেখানে মারামারি কাটাকাটি সেখানে যেও না, কিন্তু একটি কথাও সে শ্যামুয়েলকে বলতে পারে নি। রেণুকে সান্ত্বনা দেয়া দূরে থাক, শ্যামুয়েল যখন 'চললাম' বলে চলে গেল তখন সে তাকে বিদায় দেবার ভাষাও খুঁজে পায় নি। দেয়ালে ঠেস দিয়ে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

মধু শ্যামুয়েলের সমস্ত জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে দিল। সে-ই দু-একবার হাসি মুখে রেণুর কান্না থামাতে চেষ্টা করল।

ওদিকে বসন্তর সমস্ত শরীর ছমছম করে উঠল। বিচ্ছেদের কথা ভাবতেও তার আজকাল ভয় করে। রেণুকে কাছে টেনে নিয়ে ঠকঠক করে বসন্ত কাঁপতে থাকে।

কবরখানার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভয় আজকাল আর লাগে না বটে বিজলীর কিন্তু বুকটা জ্বলে যায়। খাঁ খাঁ করে। আর চোখ দুটোও সজল হয়ে ওঠে। যারা আর নেই তাদের রাজ্যে প্রবেশ করতে পা কাঁপে বিজলীর। তাদের স্মরণ-স্তম্ভ আবার নতুন করে ললিতকেও ঠেলে দেয় তার মনের মধ্যে।

বিজলী তাকায় এপাশে-ওপাশে। আকাশে-মাটিতে। ফুল পাতা আর গাছের দিকে। কান্না জমে আছে ধুলোয়। লাল সুরকিতে। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে। এইখানে হারিয়ে গেছে, মিশে গেছে কত হাজার ললিত।

তবু তারই ললিতকে খুঁজতে চায় বিজলী হাজার মৃত ললিতের ভিড়েই। খুঁজতে তাকে হবেই। ফিরে পেতেই হবে।

অনুসন্ধানের রকমটা ঠিক ধরতে পারে না বিজলী। তাই চুপচাপ ঘরের কোণে বসে চোখের জল ফেলে দিন কাটায়। যদিও নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে বুঝতে পারে শুধু অলস কান্না দিয়ে ফিরিয়ে আনা যায় না মনের মানুষকে। চুপচাপ বসে না থেকে ঘুরতে হয়। খুঁজতে হয়। কাজের মধ্যে দিয়ে, প্রেমের মধ্যে দিয়ে, সমবেদনার মধ্যে দিয়ে নাগাল পেতে হয় মনের মানুষের।

তাহলে কবরখানায় এসে বৃথাই কেন খোঁজাখুঁজি করে বিজলী!

যুদ্ধের থম-থম-করা ভয়ঙ্কর অন্ধকারেও আলোর একটা বিন্দু জ্বলে ওঠে বিজলীর মনে। মৃত আর জীবিতর ভাবনা একটা

অদ্ভুত প্রেরণা জাগায়। বাঁচা আর মরার অর্থটাও যেন অন্যরকম হয়ে যায়।

সে নিজেও যেন মরেছিল এতদিন। তার বাপ ভাই রেণু মধু—তার চেনাশোনা যারা আছে কবরখানার আশেপাশে, কী অদ্ভুতভাবে মরে আছে সকলেই। ললিত নেই কিন্তু যারা বেঁচে আছে তারাও যেন নেই।

কবরখানার ভেতরে আর বাইরে অসংখ্য মৃতের ভিড়ে দাঁড়িয়ে নতুন প্রাণের ছোঁয়ায় নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয় বিজলীর। যেন সে একাই বেঁচে উঠেছে হঠাৎ। কেমন করে কে জানে! ললিত মরে তার প্রাণটা তাকে দিয়ে গেল নাকি। আর এখানকার যত মৃত মানুষ—তারা সকলে কি তাদের প্রাণ পাঠিয়ে দিল বিজলীকে? তা না হলে এত প্রাণশক্তি কোথা থেকে পায় সে।

একটু জোরে পা চালিয়েই সরলার কবরের দিকে বিজলী ছুটে যায়। বসন্ত বসে আছে এখনও সেখানে। তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছে না থাকলেও কবরখানায় আসতে হয় বিজলীকে মাঝে মাঝে। রেণু নতুন বউ। তাকে এখন এখানে পাঠানো ভালো দেখায় না বলে নিজেই আসে বিজলী। দু দিন পর শ্বশুরকে ডাকাডাকি করতে রেণুকেই পাঠাবে সে।

রোজকার মতো ভয়ে ভয়ে মেয়ের মুখের দিকে বসন্ত তাকায়। সে-দৃষ্টি বোধহয় লক্ষ করে না বিজলী। সবে সন্ধ্যে হয়েছে। কিন্তু চাঁদ নেই আজ আকাশে। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। একটা মধুর গন্ধ এসে নাকে লাগছে। কোনো নতুন ফুল ফুটেছে বোধহয়।

এক সুরে পাখির মতো আজও বিজলী বলে, বাবা বাড়ি চলো। রাত হয়ে গেছে।

বিজলীর গলার স্বর আজ অন্য রকম লাগে বসন্তর কানে। কিন্তু অন্ধকারে মেয়ের মুখ ভালো করে দেখতে পায় না সে। বসন্ত উঠে

দাঁড়ায় না। বসে বসেই শক্ত করে মেয়ের হাত ধরে। তবু অন্ধকার বলেই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে। দিনের বেলায় বিজলী সামনে এলেই মাথাটা যেন আপনা থেকেই নিচু হয়ে যায় বসন্তর। সে যেন অপরাধ করেছে মেয়ের কাছে। সে যেন মেরে ফেলেছে ললিতকে। তাই বিজলী রাগ পুষে রাখে তার ওপর।

কিন্তু আজ কবরখানার অন্ধকারে সরলার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতে মেয়ের অহেতুক অভিমান ভেঙে দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ে বসন্ত। বোকা মেয়ে। ভুল করে অবিচার করে বাপের ওপর। বুঝতে পারে না যে এই পৃথিবীতে মরে না কেউ। মেয়ের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে থাকে বসন্ত। এই মুহূর্তে ভুল ভেঙে দিতে চায় তার।

বিজু, দৃঢ় মনে হয় বসন্তর গলার স্বর, আমার কথা শোন—তোর মা মরে নি, একটু থামে সে, ললিতও মরে নি—আমাকে বিশ্বাস কর। কেউ মরে না রে—কেউ মরে না। তবে কেন মুখ ভার করে থাকিস তুই? কেন আমার ওপর রাগ রাখিস?

বসন্তর কথাটা সহজেই বিশ্বাস করে নেয় বিজলী। প্রত্যেকের বেঁচে থাকবার কথা অস্বীকার করতে ইচ্ছে হয় না। কবরখানার অন্ধকারে বুড়ো বাপের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবতে ভারি ভালো লাগে—কেউ মরে না।

বেশ উৎসাহ নিয়ে বলে ওঠে বিজলী, কেউ মরে না, না বাবা?

হ্যাঁ রে বিজু। তাই তো আজও আমি তোর মার সঙ্গে কথা বলি। তাকে দেখতে পাই।

আমি জানি। আমরাও মরব না বাবা।

দেখ না দেখ, উঠে দাঁড়ায় বসন্ত, কত লোক এখানে মাটির তলায় বেঁচে আছে। আয়। এই খোকা বেঁচে আছে। এই বাবু ঘুমচ্ছে। ওই সাহেব শুয়ে আছে—

কর্কশ স্বরে একটা পাখি ডেকে ওঠে। ডানা ঝাপটায়। অন্ধকার গভীর হয়ে আসে। তবুও মৃতের রাজ্যে প্রাণের সন্ধান পেয়ে চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়ায় বাপ আর মেয়ে।

বিজলী ভেবেছিল রেণু কয়েকদিন হয়তো বিচ্ছেদের শোকে বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারবে না। কিন্তু পরদিনই সব ঠিক হয়ে গেল। বিজলীকে সরিয়ে দিয়ে একদিনেই রেণু সংসারের সমস্ত ভার নিজের হাতে তুলে নিল, প্রাণপণে শ্বশুরের সেবা আরম্ভ করল।

আর এক সময় দুটো পান একসঙ্গে গালে পুরে আড়ালে বিজলীকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের এদিকে পিওন কখন আসে ভাই ?

একটু ভেবে বিজলী বলল, সকালেও আসে, আবার কখনও বিকেলেও আসে, কেন ?

বিজলীর গা টিপে ফিক করে হেসে রেণু বলল, এত বয়স হল তাও বুঝতে পার না, তুমি কী গো !

অবাক হয়ে বিজলী জিজ্ঞেস করল, কী ?

দূর বোকা, আর একবার বিজলীকে চিমটি কাটে রেণু, তোমার দাদার চিঠি আসবে যে, সে তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে আসে, খুব বড় চিঠি লিখবে বলেছে। কত যে রসের কথা লেখা থাকবে তাতে! তোমাকে আমি কিন্তু সে-চিঠি কিছুতেই দেখাব না, তুমি আবার জোর করে দেখতে চেও না যেন—

অবাক হয়ে যায় বিজলী, পরের চিঠি আমি কেন জোর করে দেখতে চাইব ?

বিজলীর কথা শুনে হতাশ হয় রেণু। সে আশা করেছিল বিজলী চিঠি দেখাবার জন্যে জোর করবে, কী লিখেছে জানতে চাইবে। হয়তো বলবে, চিঠি আমার হাতে পড়লে আমি লুকিয়ে

রাখব কিন্তু। আগে নিজে পড়ব তারপর তোমায় দেব। তা নয়, রেণু ভাবে, এর যে কোনো উৎসাহ নেই। এ আবার কেমন মেয়ে!

নিরাশ হয়ে রেণু সরে যায়।

রাত্তির বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর রেণু বিজলীকে বলে, আমার একা শুতে ভারি ভয় করে, আজ কিন্তু তোমাকে আমার সঙ্গে শুতে হবে—

কারুর সঙ্গে শুলে বিজলীর ঘুম হয় না। তার একা শোয়ার অভ্যাস অনেকদিনের। তবু রেণুর নিঃসঙ্গ অবস্থার কথা মনে করে তার দুঃখ হয়। তাই তার অনুরোধ সে এড়াতে পারে না।

মাথা নেড়ে বলে, আচ্ছা।

খাটে শুয়ে বিজলী বুঝতে পারে তার চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। এখনও রেণু আসে নি, সংসারের কী কাজ শেষ করছে।

মাথার পাশের জানলা খোলা। আকাশ স্পষ্ট দেখা যায়। বিজলী সেদিকে তাকিয়ে তারা গুনে গুনে কী যেন খোঁজবার চেষ্টা করে।

এমন সময় রেণু এসে তার পাশে শুয়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, অমন মুখ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে দিন রাত কী ভাব?

কই কিছু ভাবি না তো।

দিনরাতই তো দেখি একটা না একটা ভাবনা তোমার লেগে আছে।

বিজলী কথার উত্তর না দিয়ে হাসে শুধু।

বুঝতে পারি তোমার অবস্থা, বিজ্ঞের মতো মুখের ভাব করে রেণু বলে, খুব বুঝতে পারি। এই দেখ না, তোমার ভাই চলে

গিয়ে আমার মনে একটু শান্তি আছে নাকি। সত্যি মেয়েমানুষের একা থাকা পোষায় না ভাই, যাই বল। একটা বিয়ে করে ফেল, বুঝলে? তাহলে সব ভাবনা দূর হয়ে যাবে।

বি—য়ে, একটু টেনে বিজলী কথাটা উচ্চারণ করে, বিয়ে ছাড়া আমার কি আর করবার কিছু নেই রেণু?

না, বেশ জোর দিয়ে রেণু বলে, বিয়ে করা ছাড়া মেয়েমানুষ আবার করবে কী?

আরও তো কত কাজ আছে, কত লোকের কত দুঃখ কষ্ট আছে, পাদ্রী সাহেব-মেমদের দেখ নি? নিজেদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে তারা তো পরের দুঃখ মাথায় তুলে নেয়—

তুমিও কি তাই করবে নাকি? বিজলীর দিকে রেণু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

নিশ্চয়ই। তাই করবার জন্যে তো বসে আছি—

বিজলীর কথার একটি বর্ণও রেণু বুঝতে পারে না। মেয়েটা বলে কী! ওর মাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো?

সে বলে ওঠে, থাম তুমি। যত বাজে কথা! বিয়ে করে ফেল দেখি, সব পাগলামি তোমার দূর হয়ে যাবে তাহলে।

বিজলী হেসে বলে, তোমাকে তো বললাম রেণু আমি কী করব—

আরে রাখ, আরও জোরে বিজলীকে চেপে ধরে রেণু বলে, এমনি করে কোনো পুরুষ মানুষ জড়িয়ে ধরলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার দাদার পাল্লায় পড়ে আমার যা দশা হত রোজ রাত্তিরবেলা যে ওসব আজেবাজে ভাবনা ভাববার সময় পেতাম না। কিন্তু ভাই আমার দুঃখটা একবার ভেবে দেখ, দুদিনের জন্যে বুকে চেপে ধরে লোকটা কোথায় উধাও হয়ে গেল—কবে আসবে ঠিক নেই। এখন আমি কী করি বল তো? একটু চুপ করে থেকে

হেসে রেণু আবার বলে, শুনবে এক রাত্তিরে তোমার দাদার কাণ্ড ?

রেণুর দৃঢ় বাঁধন থেকে কোনো রকমে নিজেকে মুক্ত করে নেয় বিজলী, আজ আমার বড় ঘুম পাচ্ছে ভাই।

পাশ ফিরে ঘুমের ভান করে সে চুপ করে শুয়ে থাকে।

তার দিকে তাকিয়ে আর একবার রেণুর মনে হয়, সত্যি মেয়েটা কী ! এমন রসের গল্পও শুনতে চায় না !

বিজলীর চোখে কিন্তু ঘুমের লেশমাত্র নেই। খোলা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সে দেখে তারাগুলি ঠিক তেমনি জ্বলজ্বল করছে।

সকালবেলা কবরখানায় যাবার আগে বসন্ত খেতে পারল না। থালা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

রেণু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, এ কী বাবা, খাবেন না ?

না, গম্ভীর মুখে বসন্ত বলল, খাব কী ? বুড়ো মানুষ আমি, এ খাওয়া কি মুখে দিতে পারি ? বসন্তর গলার স্বর ভারি হয়ে এল, কে আর আমাকে দেখবে এখন ? সে তো নেই, চোখের জল গোপন করে সে বেরিয়ে গেল।

ভয়ে আর লজ্জায় দিশাহারা হয়ে রেণু ছুটে আসে বিজলীর কাছে।

চোখে জল নিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, আমার কী দোষ ভাই ? বাবা না খেয়ে রেগে উঠে গেলেন। আমার কি ইচ্ছে করে না সকলকে ভালো করে খাওয়াতে ? কিন্তু পয়সা কই ? আর জিনিসপত্রের যা দাম ! কেমন করে কিনব বল ?

সে কী, বাবা খায় নি ?

না, কই আর খেলেন !

বিজলী অবাক যায়। বসন্তকে কোনোদিন কোনো কারণে

সে বেশি বিরক্ত হতে দেখে নি। তবু বিজলী বুঝতে পারে কত দুঃখে সে না খেয়ে উঠে গেছে। সে ভেবে পায় না এর জন্যে দায়ী কে।

রেণুকে সান্ত্বনা দেয় বিজলী, দুঃখ পেও না, বুড়োমানুষ কিনা।

কিন্তু আমি কী করব বল? দুদিন পরে এমন খাওয়াও যে সামনে দিতে পারব না।

তুমি কিছু ভেব না। সব ঠিক হয়ে যাবে। শিগগিরই গির্জের মাঠে মেলা বসবে, তাতে যা টাকা উঠবে সেই টাকা দিয়ে সাহেবরা আমাদের দরকারী জিনিসপত্র কিনে দেবে।

সত্যি নাকি? রেণু খুশী হয়ে বলে, তবে তো বেশ মজা হবে ভাই। দেখ না, বউ হলাম, কিন্তু কী কপাল আমার! একটা ভালো কাপড় কেনবার উপায় নেই। কিছুই তো পাওয়া যায় না। আর পাওয়া গেলেও অত দাম দিয়ে লোকে কিনবে কেমন করে বাপু?

তা ঠিক, বিজলী আস্তে আস্তে বলে।

তবু মনের জ্বালা সে সহ্য করতে পারে। তাতে যেন মহাশান্তির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকে। কিন্তু সংসারের এই তুচ্ছ দৈন্য সে সহ্য করবে কেমন করে?

বাইবেল খুলে বার বার বিজলী একটা অংশই পড়ে যায়, তুমি তোমার ক্রুশ তুলিয়া লও। আপনাকে অস্বীকার কর। এবং আমার পশ্চাতে আইস……

তার মনে হয় কবে এই দৈন্য আর অভাবের কঠিন প্রাচীর ভেঙে সমস্ত পৃথিবীর দুঃখভার মাথায় তুলে নেবে! অসংখ্য মানুষের বেদনা আর হতাশার প্রচণ্ড তরঙ্গে তার নিজের দুঃখ দৈন্য তৃণের মতো ভেসে যাবে।

কবে—কবে সে বিশাল কর্মজগতে নতুন করে বাঁচতে পারবে! কে যেন সারা দিন রাত তাকে ডাকে।

॥ পাঁচ ॥

সেই প্রথমবার ওরা জর্জ মহেন্দ্রলাল দাসকে ভয় পেতে দেখল। সেই প্রথমবার ওরা বুঝল যে সাহেবরাও ভয় পায়। ওরাও প্রাণের ভয়ে পালায়। প্রয়োজন হলে আত্মসমর্পণও করে যারা দলে ভারী তাদের কাছে।

অ্যালবার্টের শরীর ভালো যাচ্ছে না কদিন থেকে। রোজ নাকি জ্বর হয়। কাশিও আছে বেশ। সময়টা ভালো নয় তাই তার ভয় একটা ভারী অসুখে পড়ে না যায় শেষ অবধি। যদি তাই হয় তাহলে উপবাসে দিন কাটবে তার।

ছুটি নাও না কিছুদিন, মধু বলে, দিন কয়েক বিশ্রাম করলেই দেখবে শরীর ঠিক হয়ে গেছে ?

না ভাই, সাহেব রাগারাগি করে। এত কম জ্বরে ছুটি নিলে মাইনে কাটবে ঠিক। তখন খাব কী ?

তা বটে, জেমস আজও শ্যামুয়েলের সৎ পরামর্শের কথা ভুলতে পারে না, সাহেবের হুমকি শুনেই তো চুপ হয়ে গেলি সব। তখন যুদ্ধে যাবার একটা ব্যবস্থা করলে কত আরামে থাকতে পারতাম আমরা।

যুদ্ধের বাজারে সকলেই আরামে আছে, গায়ের জোরে ভারী একটা তক্তায় পেরেক ঠুকতে ঠুকতে অ্যালবার্ট বলে, মুটে মজুর মিস্তিরী সকলেই—আমরাই শুধু একঘরে হয়ে ভুগে মরছি।

জোসেফের দৃষ্টিটা কঠিন হয়ে ওঠে, যুদ্ধ অসুখ বাজ ভূমিকম্প

কিছুতেই কিছু হবে না আমাদের। ভুগে ভুগেই জীবন শেষ হয়ে যাবে।

বেশ জোরেই মধু বলে ওঠে, জীবন অতই সস্তা নাকি রে জোসেফ ?

অ্যালবার্ট কাশে ঘন ঘন—সস্তা নয় তো কী ? কুকুর, বেড়ালেরও অধম আমরা। তা না হলে টাকার লোভে জাত খোয়াই ? ভগবানের সঙ্গে বেইমানি করলে এমনি করেই ভুগে মরতে হয়।

মধু তাড়াতাড়ি ওদের পক্ষ নিয়ে বলে, ও তোর কাজের কথা নয় রে অ্যালবার্ট। আমিও তো তোদের মধ্যে আছি। কই, আমাকে তো অভাবের হাত থেকে মুক্তি দেয় নি ভগবান।

বেন হঠাৎ পরিণত কথা বলে ঠকাঠক পেরেক ঠুকে যায়, গরিব আবার জাত খোয়াবে কী ? হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান—সব গরিবকে ভুগতে হবেই। নে নে, বাজে না বকে হাতের কাজ সেরে ফেল। নইলে বাড়ি ফিরতে রাত কাবার হয়ে যাবে।

কাছাকাছি কোথাও একটা বোমা ফাটল বোধ হয়। বাইরে গোলমাল শুনতে পেল ওরা। কড়া কড়া কথার টুকরো ভেসে আসছে। এখানেই লুঠ করতে এল নাকি দুর্দান্ত ছেলের দল। শ্যামুয়েলের মাথা ফাটবার পর থেকে ওরাও ভয়ে ভয়ে রাস্তায় সাবধানে চলা ফেরা করে। প্যান্ট পরা তো ছেড়েই দিয়েছে কয়েকদিন থেকে।

দাস সাহেবের গলা শোনা গেল। ইংরেজিতে কথা বলছেন তিনি, কী চাও তোমরা ?

বাংলা বলুন, বাংলা বলুন—

হাতের কাজ ফেলে রেখে কী ব্যাপার জানবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা সকলে। এইমাত্র বোধহয় দাস সাহেব অফিসে

এসেছেন। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করবার সুযোগ পান নি তিনি। তাঁর গাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়েছে অনেকে।

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে নিজের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য বজায় রেখে ওদের কথামতো বাংলাই বললেন দাস সাহেব, কী চান আপনারা ?

আপনাকে কোট প্যাণ্ট পরা ছাড়াতে চাই। আপনার টাই ছিঁড়ে পুড়িয়ে দিতে চাই—

এসব পরতে এখন লজ্জা করে না আপনার ?

কর্কশ হয়ে উঠল দাস সাহেবের গলার স্বর, আপনাদের কাছে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি ?

অলবত—দাস সাহেবের মাথার টুপি দূরে ছুড়ে ফেলে দিল একজন। আর একজন টাই টেনে ছিঁড়ে ফেলল।

চিৎকার করে উঠল তাঁর ড্রাইভার।

পুলিস—পুলিস—

শাট আপ্, দাস সাহেবকে ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে কঠিন স্বরে একজন বলল, পুলিসের সাধ্য নেই আমাদের কাছে ঘেঁষে। থান ইট দিয়ে আমরা পিস্তলের গুলি ঠেকাই—বুঝেছেন কালা সাহেব ?

বোধহয় কিছু একটা বুঝলেন দাস সাহেব। তর্ক আর করলেন না তিনি ওদের সঙ্গে। কথা বললেন না একটাও। মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে অফিসে এসে বসলেন।

ওরা ভেবেছিল আজ দাস সাহেবের মেজাজ চরমে উঠবে—অফিসে একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলবেন তিনি! কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই করলেন না সাহেব। একটা কঠিন কথাও বললেন না কাউকে। পরদিন ওরা আরও আশ্চর্য হয়ে দেখল, দাস সাহেব ধুতি পাঞ্জাবি পরে অফিসে এসেছেন। ওরা যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ বার বার তাকাতে লাগল তাঁর দিকে।

ফিক করে হেসে ফেলে জোসেফ, চেনাই যায় না রে।

জেমস বলে, ছোকরাদের দাপট দেখে খুব ভয় পেয়েছে।

বেন জোসেফের কাছে সরে আসে, এত ভয় পেয়েছে যে এক কথায় ভোলটাই পাল্টে ফেলেছে।

উপায় কী!

ওদিকে জ্বর বাড়ে অ্যালবার্টের। বোধহয় চিকিৎসার দরকার। কিন্তু পয়সা তো নেই কারুর কাছে। কাকুতি-মিনতি করে পাড়ার ডাক্তারের কাছে না হয় যাওয়া চলতে পারে, কিন্তু ওষুধ তো পাওয়াই যায় না যুদ্ধের বাজারে। পাওয়া গেলেও দাম এতই বেশি যে ওদের পিছিয়ে আসতে হয়। ভুগে ভুগে মরে যাওয়াটাই সব চেয়ে সোজা বলে মনে হয় তখন।

আমরা আছি অ্যালবার্ট, মধু আশ্বাস দেয়, আমরা সকলে মিলে সাহেবকে বলব। ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক তুমি। দেখি কেমন যায় তোমার চাকরি।

হি হি করে হাসে বেন, চাকরি গেলে আমরাও সকলে মিলে ওই বেয়াড়া ছোকরাদের মতো সাহেবের গাড়ি ঘিরে ধরব—

তখন কী পরে আপিসে আসবে রে সাহেব?

কে জানে, আমাদের মতো পায়জামা পরেও আসতে পারে, নিজেই জোরে হেসে ওঠে বেন, খবর রাখিস, সাহেবের ভিটেয় ঘুঘু চরল বলে? মেমসাহেব বড় নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে শুনি আজকাল—

মধু তাড়া দিয়ে বলে, থাম থাম। মনিবের কেচ্ছা করিস না বেন, জিবে পোকা পড়বে।

মধুর কথা শুনে চুপ করে যায় বেন। ভুবনবাবু ঘোরাঘুরি করছে। তার কানে কথা গেলেই সাহেবকে গিয়ে লাগাবে ঠিক। বেনের দিকে ঘুরে ঘুরে ভুবনবাবু তাকিয়ে দেখে। তারপর কাছে এসে হাত চালাতে বলে আর একটু। গোটা চারেক কফিন ঘণ্টা

তিনেকের মধ্যে শেষ করতে হবে। ঘন ঘন তাগাদা আসছে। খুব নাম আছে এ বিষয়ে দাস সাহেবের। এত কম সময়ের মধ্যে কফিন তৈরি করতে পারে না আর কেউ।

ভুবনবাবু ঘরে যেতেই নিজেদের মধ্যেই আবার ওরা হাসাহাসি করে। মনে নাকি শান্তি নেই দাস সাহেবের। তাই অফিসে মেজাজ তাঁর খারাপ থাকে প্রায়ই।

রঙটা তাঁর রীতিমতো কালো বলেই কিনা কে জানে, মেমসাহেবের তেমন মন নেই তাঁর ওপর। মেমসাহেবের মন পড়েছে আমেরিকার এক মেজর সাহেবের ওপর।

রোজ আসে সেই মেজর দাস সাহেবের বাড়িতে। বড় মোটর গাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে যায় মেমসাহেবকে। আর দাস সাহেবের কালো মুখ তখন নাকি আরও কালো হয়ে যায়। কিছু বলবার সাহস হয় না বটে মেজর কিংবা মেমসাহেবকে কিন্তু চাকর-বাকরের জীবন গালমন্দ করে অতিষ্ঠ করে তোলেন তিনি। তাঁর বেয়ারা এডওয়ার্ডের কাছে থেকেই এসব কথা শুনেছে এরা।

মেমসাহেব ফিরে এলে ভয়ানক ঝগড়া বাধে সাহেবের সঙ্গে। কেউই নাকি কম যান না। কাচের বাসন ভাঙার শব্দও পাওয়া যায় অনেক রাতে। তবু দিনের পর দিন আসে সেই যুদ্ধের মেজর সাহেব।

কিন্তু ওসব কথায় কাজ কি এদের। মাঝে মাঝে ওদের ওপর অকারণে সাহেবের মেজাজ বিগড়ে যায় বলেই ওরা কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করে। শুধু শুধু গালাগাল খেয়ে চুপচাপ বসে থাকতে চায় কে আর।

মুখ দিয়ে একটা বিশ্রী রকম শব্দ করে হঠাৎ টলে পড়ে অ্যালবার্ট। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা তক্তাটাও তার হাত লেগে শব্দ করে মাটিতে পড়ে যায়। কাজ বন্ধ করে সকলেই একে একে উঠে এসে তার কাছে জটলা করে। মধু ছুটে গিয়ে এক বালতি

জল নিয়ে এসে তার মুখে আর মাথায় ছিটিয়ে দেয়। তবু জ্ঞান হয় না অ্যালবার্টের।

ইস, গা পুড়ে যাচ্ছে। এত জ্বর নিয়ে কাজ করতে আসে কেউ। ওরে জোসেফ, রিক্স ডেকে আন একটা—

দাঁড়া, মানুষটা আগে একটু সুস্থ হোক।

তক্তা চেরার আর পেরেক মারবার ঠকাঠক শব্দ শুনতে না পেয়ে ঘরের মধ্যে ভিড় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ভুবনবাবু, কি হল রে? কফিনগুলো আজ আর শেষ হবে না দেখছি--

অ্যালবার্ট মরে যাচ্ছে বাবু।

কই? আরে! সাহেবকে খবর দিস নি এখনও? ভুবনবাবু নিজেই খবর দিতে যায় দাস সাহেবকে।

দাস সাহেব নিজে আসেন না এ-ঘরে। ভুবনবাবুকে আদেশ দেন এখুনি অ্যালবার্টকে সাবধানে বাড়ি পৌঁছে দিতে। দেরাজ খুলে টাকাও বের করে দেন একটা।

দাস সাহেব ভুবনবাবুকে বলেন, ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই আপনি ফিরে আসুন তাড়াতাড়ি। এদের তাড়া দিয়ে কাজ করিয়ে নিন। একটা ছুতো পেলে কাজ বন্ধ করে এরা হৈ-হৈ করতেই জানে শুধু—ওদিকে লোকের তাগাদায় আমার মান যায়।

আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি স্যার, ভুবনবাবু তৎপর হয়ে ওঠে রিক্স ডেকে অ্যালবার্টকে বাড়ি পাঠাতে। ভাড়া লাগে চার আনা। কিন্তু বাকি পয়সাটা আর দাস সাহেবকে ফেরত দিতে মন চায় না ভুবনবাবুর।

তিন কুলে কেউ নেই অ্যালবার্টের। অসুখের সময় মুখে জল দেবার ভাবনাটা তাকে সব চেয়ে আগে পীড়া দেয় বলেই রোগ চেপে রেখে কাজ করতে যায়। একা একা বাড়ি বসে ধুঁকতে

ভালো লাগে না তার। তবু মনে মনে একটা ভরসা পায় বলেই এ-ঘরটা ছেড়ে অন্য কোথাও উঠে যায় নি অ্যালবার্ট।

তার ঘরে জিনিসপত্র বিশেষ কিছুই নেই। মাদুর বালিশ আয়না চিরুনি আর টিনের ছোট একটা বাক্স। এই ঘরের জন্যে তাকে ভাড়া গুনতে হয় মাসে আট টাকা। কিছুদিন আগে আরও কম ভাড়ায় এর চেয়ে অনেক ভালো ঘর একটু দূরে সে পেয়েছিল। কিন্তু সেখানে উঠে যেতে অ্যালবার্টের মন চায় নি। তার জানা-শোনা বন্ধু বান্ধব সকলেই এ-পাড়ায়। বিপদে-আপদে তাদের কাছে পায় বলেই কম ভাড়ার ভালো ঘরে একা সুবিধা ভোগ করতে উঠে যায় নি। দরদী বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে অনেক অসুবিধার মধ্যে বাস করার একটা আনন্দ আছে বলে মনে হয় অ্যালবার্টের। এবারকার অসুখে সেটা সে বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছে।

পালা করে রাত জাগে মধু জোসেফ জেমস আর বেন। কিছু টাকাও আগাম ওরা আদায় করে নিয়েছে দাস সাহেবের কাছ থেকে। বুড়ো বসন্ত আসে। ডাক্তার হ্যারি মণ্ডল এদের তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে রোজ নিয়ম করে একবার দেখে যায় অ্যালবার্টকে। এক জাতের লোক বলে পয়সা না নিয়ে এদের কাছে উদারতার পরিচয়ও দিয়ে যায়।

কিন্তু আসল অশান্তির সৃষ্টি হয় অ্যালবার্টের অসুখ সেরে যাবার পর। রোগা দুর্বল লোককে রাখতে ঘোরতর আপত্তি জানান দাস সাহেব। তা ছাড়া নাকি কাজের তেমন চাপ নেই এখন। বেশি লোক রাখবার ক্ষমতা নেই তাঁর। এই কথাটা অ্যালবার্টকে সোজা ভাষায় বুঝিয়ে তাকে বিদায় করে দেন দাস সাহেব।

কথা শুনে মাথাটা ঘুরে যায় অ্যালবার্টের। দুর্বল শরীর আবার টলে ওঠে! যাবে আর কোথায়! কাজ গেলেও টান যায় না কাজের

ওপর। তাই ওদের পাশে এসে মাথাটা ছুই হাতে চেপে ধরে বসে পড়ে অ্যালবার্ট।

কাজ থামিয়ে তার প্রত্যেকটি কথা মন দিয়ে শোনে এরা। অবাক হয়ে যায়। জ্বলে যায়। ইচ্ছে হয় অগস্ট আন্দোলনের সেই লোকগুলোর মতো সাহেবকে ঘিরে ধরে শাসায় সকলে মিলে। একটা লোকের কাজ নিয়ে খেলা করবার সময় নাকি এখন। মাইনে তো মাসে মোটে বত্রিশ টাকা।

করাতের ওপর ছুম করে লাথি মারবার ভঙ্গিতে নিজের পা-টা বসিয়ে দিয়ে জোসেফ বলে, কফিন বানিয়ে বানিয়ে নিজের কবরে যাবার রাস্তাটা সোজা করছি, তাও করতে দেবে না লোকটা?

মধু চুপচাপ অ্যালবার্টের দিকে তাকিয়ে তাকে কিছুক্ষণ। রোগা মানুষকে বড় অসহায় বলে মনে হয়। তার কাছে উঠে এসে শান্ত স্বরে মধু বলে, তোকে কাজে বাহাল করতেই হবে দাস সাহেবকে। না করলে—জেমস মধুর কথাটা শেষ করে দেয় সাংঘাতিক রকম উৎসাহের সঙ্গে, আমরাও কাজে ইস্তফা দিয়ে তোর সঙ্গে বেরিয়ে যাব এখুনি।

মাথা থেকে হাত ছুটো নামায় এবার অ্যালবার্ট, কিন্তু যাবি কোথায়? খাবি কী?

মধু চেঁচায়, তুই খাবি কী শুনি?

আমার জন্যে তোরা সকলে উপোস করবি?

থেকে থেকে খাঁটি কথা বলে বেন, সকলে মিলে উপোস করলে তোর উপবাসের কষ্টটা অনেক কম হবে রে অ্যালবার্ট সে-কথা বুঝিস না কেন গাধা? আর উপোস তো জনে জনে আমরা এমনিতেই করছি।

মধু বলে, বলি তাহলে এ-কথা সাহেবকে?

সকলে জোর গলায় বলে ওঠে, অলবত!

গলার জোর শুনে কে বলবে ছু বেলা পেট ভরে খেতে পায় না

ওরা। কে বুঝবে রোগা শরীরের সঙ্গে গলার এত আশ্চর্য অমিল। সব কটা লোক বৈদ্যুতিক প্রবাহের তীব্র শক্তি বুকে নিয়ে মাথা টান করে উঠে দাঁড়ায়। ভুবনবাবুর ঘরে যায় না ওরা। একজন গিয়ে তাকেই ডেকে আনে এ-ঘরে।

কথা শুনে থেমে থেমে ভুবনবাবু বলে, আমাকে বলে কী হবে? আমি কী করতে পারি বল?

সাহেবকে বলুন, এগিয়ে এসে জেমস বলে, অ্যালবার্টের সঙ্গে আমরাও বেরিয়ে যাচ্ছি এখুনি।

ভুবনবাবু ঢোঁক গেলে, সাহেবকে বলব?

হ্যাঁ হ্যাঁ। অ্যালবার্টের কাজ গেলে আমরাও একদিন কাজ করতে পারব না এখানে।

মধু যোগ করে, সোজা কথা বাবু।

কিন্তু জর্জ মহেন্দ্রলাল দাসের সামনে দাঁড়িয়ে সেই সোজা কথাটা বলতে গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসে ভুবনবাবুর। তবু বলতেই হয়। ওদের দুঃসাহসের কথা। ওদের অপমানজনক ব্যবহারের কথা।

ওদের নামে বেশি করে মন্দ কথা বলবার সুযোগ ভুবনবাবু ছাড়ে না। আর মান বজায় রাখতে সকলকে এক সঙ্গে ছাড়িয়ে দিলে কাজের কী ব্যবস্থা হবে দাস সাহেবের কাছে ভুবনবাবু সে-কথাও জানতে চায়।

তামাক নেই। তবু পাইপটা শক্ত করে দাঁতে চেপে ধরেন দাস সাহেব। ভুবনবাবুকে বসতে বলেন আঙুল দেখিয়ে। ভুবনবাবু বসে না। দাঁড়িয়েই থাকে।

বসুন, আমি পারমিশন দিচ্ছি, গলার স্বরে আদেশের সুরই প্রকাশ পায় দাস সাহেবের।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় ভুবনবাবু। কোনো শব্দ নেই। একতলার উঠোনে কাটা কাটা মার্বেল পাথর পড়ে আছে। এক-

মনে কী ভাবতে ভাবতে পাইপে তামাক ভরে নেন দাস সাহেব। ধোঁয়ায় নাক জলে যায় ভুবনবাবুর।

ভুবনবাবু, স্বরটা একেবারেই অন্যরকম শোনায় দাস সাহেবের, আপনি এই কোম্পানির ম্যানেজার। অনেক দায়িত্ব আপনার। এসব ছোটখাট কথা আমাকে না জানিয়ে আপনি নিজে বুদ্ধি খরচ করে থামিয়ে দিতে পারেন না ?

তাই তো করি স্যার। তবে আজকের ব্যাপারটায় আপনার একটু অ্যাডভাইস দরকার স্যার। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ওদের সাহস এত বাড়ল কেমন করে, পকেট থেকে রুমাল বের করে কাশে ভুবনবাবু, ওই বসন্তর ছেলেটা—সেই যে শ্যামুয়েল স্যার, এদের উস্কে দিয়ে গেছে বলেই এরা আজকাল বড় বড় কথা বলতে সাহস পায়।

জর্জ মহেন্দ্রলাল দাস এক মুখ পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে যেন আপন মনেই বলে ওঠেন, ননসেন্স !

যদিও ভুবনবাবুকে তিনি দায়িত্বের কথা বোঝান একটু আগে, তবুও আজকের ব্যাপারের সম্পূর্ণ ভার ছাড়তে ভরসা পান না তার ওপর। তিনি নিজেই সহজে ঠিক করতে পারেন না কী করা উচিত এই মুহূর্তে। ঘন ঘন পাইপে টান মেরে মাথায় হাত দিয়ে মাথা ঘামান জর্জ মহেন্দ্রলাল দাস।

ভুবনবাবু, বেশ দরদের সঙ্গেই ডাকেন দাস সাহেব।

বলুন স্যার ?

আপনি ভদ্রলোক—ওদের মতো ছোটলোক নন। আপনি ক্রীশ্চান হয়েছিলেন ধর্মকে ভালোবেসেই—ওদের মতো শুধু ভালো খেতে পরতে পাবার জন্যে নয়।

মুখ তুলে দাস সাহেবের কথা শোনে ভুবনবাবু। কথাটা সত্যি না হলেও শুনতে খুবই ভালো লাগে তার। একটু ভয়ও ধরে যায় মনে।

ব্যাপারটা সাহেব জানে না তো। কে আর তাঁর কানে তুলতে যাচ্ছে এখন। হয় তো ভুবনবাবু নিজে ছাড়া আর কেউই জানে না তার ধর্ম পরিবর্তন করবার আসল কারণের কথা।

কারণটা একই। ওই ছোটলোকদের মতোই ভালো খেতে পরতে পাবার জন্যে, অর্থাৎ যে-কোনো একটা চাকরি তার হবে—এই আশ্বাসেই এদের দলে নাম লেখায় ভুবনবাবু।

কিন্তু মুখ ফুটে জর্জ দাসের কথার প্রতিবাদ করে আসল কারণটা জানিয়ে দেবার এতটুকু ইচ্ছে হয় না তার। মাথা উঁচু করেই শুনে যায় সে। শুনতে শুনতে বেশ অহঙ্কার জাগে মনে। ঠিক কথাই তো।

ভুবনবাবু যে ভদ্রলোকের ছেলে সে-কথা কেউ অস্বীকার করবে না। যদিও অবস্থা অনেক আগেই খারাপ হয়ে এসেছিল তাদের। লেখাপড়া শেষ করে একটা সস্তা মেসে ভুবনবাবুর দিন কাটছিল না কিছুতেই। তাগাদার চোটে অস্থির হয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছিল।

তখন ধর্মটা বদলে জাত ঠিক রাখে ভুবনবাবু—ভদ্রলোকের জাত। তা না করলে এ-চাকরিটা তার কিছুতেই হত না। মেসওয়ালা জিনিসপত্র রাস্তায় বের করে দিয়ে গলাধাক্কা দিত।

ভুবনবাবুর মনে হয়, ধর্মকে ভালোবেসে সে যে ক্রীশ্চান হয়েছিল সে-কথা একেবারে মিথ্যে নয়। তবে খ্রীষ্ট ধর্মকে ভালোবেসে নয় ঠিক, ভদ্রলোকের ধর্ম বাঁচাবার জন্যেই ধর্মান্তর গ্রহণ করতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু এ-সব কথা উচ্চারণ করা রীতিমতো কষ্টকর এখন ভুবনবাবুর পক্ষে।

জর্জ মহেন্দ্রলাল দাস বলেন, শুধু সেই কারণেই—মানে আপনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে বলেই আপনার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। আর তাই আপনার ওপর কঠিন দায়িত্ব চাপিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি।

ভুবনবাবু হাসে। আত্মতৃপ্তির স্থূল হাসি। হাসতে গিয়ে কাশে। অনেকক্ষণ। কাশির জন্যে লজ্জা পায়। দ্রুত হাত চালিয়ে রুমাল বের করে মুখে চেপে ধরে। সাহেব না ভাবেন পাইপের ধোঁয়ার জন্যে কাশি হচ্ছে তার।

আমি জানি, দাস সাহেব বলেন, আপনার কাজের চাপ হয়-তো একটু বেশিই—

না স্যার, বাধা দিয়ে ভুবনবাবু বলে, এমন আর কী। আমার সৌভাগ্য আপনি আমাকে এতখানি বিশ্বাস করেন—

রূঢ় শোনায় জর্জ দাসের গলার স্বর, আপনাকে বিশ্বাস করব না তো কি ওই ছোটলোকদের বিশ্বাস করব? আশ্চর্য, এই সময় আমাকে এত বড় অপমান করতে ওরা সাহস পায় কেমন করে!

বললাম সে স্যার, ওই বসন্তর ছেলে শ্যামুয়েল—

যুদ্ধ না থাকলে, এই মুহূর্তে প্রত্যেকটি ছোটলোককে আমি বের করে দিতাম!

তাই দেব নাকি স্যার?

নট অ্যাট দি মোমেন্ট, জর্জ মহেন্দ্রলাল দাস বলেন, আপনি শুধু মধুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন—

এখুনি দিচ্ছি স্যার, উঠে দাঁড়ায় ভুবনবাবু।

আর, যত তাড়াতাড়ি হয় জনকয়েক নতুন লোক লাগাবার ব্যবস্থা করুন। ছোটলোক ক্রীশ্চান নয়, হিন্দু কিংবা মুসলমান মিস্তিরী হলেই ভালো হয়।

ইয়েস স্যার, ভুবনবাবু দরজা পেরিয়ে যেতে না যেতেই আবার ডাকেন সাহেব, জাস্ট এ মিনিট।

স্যার?

শরীরটা আপনার খুব খারাপ নাকি?

এই মানে জ্বর-টর হয় স্যার প্রায়ই।

বিষণ্ন হয়ে ওঠে জর্জ দাসের মুখ, কই আমাকে কিছু বলেন নি তো?

আপনি সব সময় ব্যস্ত থাকেন স্যার—

বাঃ, তা বলে অসুখ-বিসুখের কথাও জানাবেন না? স্ট্রেঞ্জ! একটু চুপ করে থাকেন দাস সাহেব, চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করেছেন?

নানা কারণে হয়ে ওঠে নি স্যার, আসল কারণটা কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারে না ভুবনবাবু। অর্থাৎ যা টাকা মাইনে পায় তাতে খাওয়া-দাওয়াটাই যুদ্ধের বাজারে ভালো করে হয় না তো ডাক্তার ডাকবে কেমন করে। নিজের দৈন্য জর্জ মহেন্দ্রলাল দাসের কাছে জানাতে সঙ্কোচ হয় ভুবনবাবুর।

কিন্তু সাহেব নিজেই বুঝতে পারেন সব। ভুবনবাবুকে সোজা-সুজি বলেন, টাকার দরকার হলে আমার কাছে বললেই তো পারেন। আমি থাকতে কেন শুধু শুধু কষ্ট ভোগ করেন?

এমন কিছু আমার হয় নি স্যার।

আমি বুঝি সব ভুবনবাবু, বড় অসহায় বলে মনে হয় দাস সাহেবকে, আমার কি ইচ্ছে হয় না সাধ্যমতো আপনাদের অভাব ঘুচিয়ে দিতে! কিন্তু নিজের চোখেই তো দেখছেন কী অসুবিধার মধ্যে চলতে হচ্ছে আমাকে! কবে যে যুদ্ধটা থামবে তাও বুঝতে পারছি না—

আমি ভালোই আছি স্যার, দাস সাহেবকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে শরীরটা হঠাৎ যেন ঠিক হয়ে যায় ভুবনবাবুর।

ম্লান হাসেন দাস সাহেব, তবু আসছে মাস থেকে দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব আপনার। দেখবেন চিকিৎসার কোনো ত্রুটি না হয়, পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সাহেব বলেন, এটা কিন্তু মাইনে নয়, এটা থাক আপনার কাছে—

দাস সাহেবের কাছ থেকে নগদ টাকা নিতে লজ্জা হয় ভুবনবাবুর। তবু নিতে হয়। সাহেব দিচ্ছেন, ফেরাতে সাহস হয় না। টাকাটা পকেটে রেখে দেয় ভুবনবাবু।

মধুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন এবার। আর কাউকে নয় শুধু মধুকে, দাস সাহেব মাথা নিচু করে বলেন।

মধু আসে হুকুম পেয়েই। দাস সাহেবের শান্ত চেহারা দেখে থমকে যায়। হয়তো তার চাকরিটাই যাবে সব চেয়ে আগে। ভুবনবাবু খুব খানিকটা লাগিয়ে গেছে বোধ হয় তার নামে। সে একাই হিন্দু এখানে। কাজেই তাকেই ছাড়িয়ে দেয়া ঠিক করেছেন সাহেব। কিন্তু তাঁর কথা শুনে মধু অবাক হয়ে যায়।

মধু, দাস সাহেব দরদ দিয়ে বলেন, শুনলাম তুমি নাকি আমার এখানে কাজ করতে চাও না?

মধু মাথা চুলকোয়। ঢোঁক গেলে। কাশে। কথা বলে না। মুখ নামায়।

একমাত্র তুমিই ভালো কাজ জান। তোমার ভরসাতেই আমি বেশি অর্ডার নিতে পারি—জান তুমি সে-কথা?

কিছু না জানলেও মধু বলতে বাধ্য হয়, জানি সাহেব।

তাহলে সব জেনে-শুনে কেন তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমার অসুবিধা ঘটাতে চাও?

সাহেব, ওরা সকলে—

গলার স্বর তোলেন জর্জ মহেন্দ্রলাল দাস, ওদের নাম করবে না আমার কাছে। অপদার্থের দল! ওরা না থাকলে কোনো ক্ষতি হবে না আমার, মধুর মুখের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে বেশ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন দাস সাহেব, আমি শুধু জানতে চাই তুমি কেন কাজ ছাড়তে চাও? কে জুলুম করল তোমার ওপর?

মধুর মুখে কথা ফোটে এবার, জুলুম কেউ করে নি সাহেব, আর একবার ঢোঁক গেলে মধু, মানে সাহেব, অ্যালবার্টের চাকরি গেছে বলে—

হা হা করে হেসে ওঠেন জর্জ মহেন্দ্রলাল দাস, তাতে তোমার কী? ওর জায়গায় আমি ভালো লোক নিয়ে আসব। তোমার কাজের সুবিধা হবে অনেক, একটু ভেবে দাস সাহেব আবার বলেন, অ্যালবার্ট এখন বেশি খাটাখাটি করলে মরে যাবে। ওর একটু বিশ্রামও তো করা দরকার।

কিন্তু পয়সা যে ওর মোটে নাই—

দাস সাহেব হঠাৎ বলে বসেন, তুমি কী চাও? ওকে আমি আবার কাজে নিয়ে নিই?

হ্যাঁ সাহেব। যদি দয়া করেন—

গম্ভীর মুখে সাহেব বলেন, এ-কথাটা তুমি সোজা এসে আমাকে বলতে পারতে না? চাকরি ছাড়ব বলে হুমকি দাও কেন? কথায় বলে না, কারুর ভালো করতে নেই, জুতোয় পাইপ ঠুকে ঠকঠক শব্দ করেন দাস সাহেব, ভাবলাম অসুস্থ লোকটা কিছুদিন বিশ্রাম করবে—কিন্তু তোমাদের জন্যে তা দেখছি ওর কপালে নেই। যাও, কাজ করতে বল অ্যালবার্টকে।

খুশী হয়ে মধু বলে, আমার অপরাধ নেবেন না সাহেব। আমাকে মাপ করবেন।

না মধু, মাপ আমি ওদের সকলকে করতে পারি কিন্তু তোমাকে নয়—তোমার এমন চালচলন আমি আশা করতে পারি না।

স্বর জড়িয়ে যায় মধুর, আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে সাহেব—

হ্যাঁ খুবই অন্যায়। তুমি হিন্দু। আমার আপিসের সব চেয়ে কাজের লোক। তোমার কাছ থেকে আমি আরও ভালো কাজ আশা করি—হুমকি নয়। যাও, এবার ওদের সকলকে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে। অ্যালবার্টকেও।

ওরা আসে বেশ শব্দ করে। চাকরি রয়ে গেছে কিনা সকলের। অ্যালবার্টেরও। তাই সকলে খুশী মনেই আসে সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। ভয়ে ভয়ে নয়। তবে দাস সাহেব কী বলবেন ঠিক বুঝতে পারে না। তাই চুপচাপ সাহেবের কথা শোনবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে।

তবু অনেকক্ষণ কথা বলেন না দাস সাহেব। ওদের দিকে তাকিয়েও দেখেন না। সামনে সাদা কাগজ খুলে সেদিকেই চোখ রেখে আঙুলের ফাঁকে দামী কলমটা নাচাতে থাকেন।

মুখ তোলেন দাস সাহেব, সকলে একসঙ্গে কাজ ছেড়ে দিয়ে আমার ক্ষতি করতে চাও? ভাবো তোমরা ছাড়া কাজ চলবে না আমার? হঠাৎ উঠে দাঁড়ান তিনি, জানো না আমি নিজে করাত চালাতে পারি, স্ক্রু লাগাতে পারি—মার্বল পাথরের ওপর নাম খোদাইএর কাজও আমার জানা আছে?

জানি সাহেব।

জানো এক ডাকে রাতারাতি হাজার মিস্তিরী এনে কাজে লাগাবার ক্ষমতাও আমার আছে?

ওরা মাথা নিচু করে থাকে। কথা বলে না।

যা হোক, আমি কৈফিয়ত চাইবার জন্যে তোমাদের ডাকি নি। আমি তোমাদের ডেকেছি শুধু এই কথাটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে যে এই যুদ্ধের সময় লোকের চোখে ঘুম নেই। দুদিন পরে কে কোথায় ছিটকে পড়বে তাও ঠিক নেই, পাইপটা আবার ধরিয়ে নেন জর্জ দাস, তোমরা রাজার জাত—আমার জাত। বিদেশী শত্রুরা যখন একেবারে মাথার কাছে এসে পড়েছে তখন হিঁদুদের মতো ছোট সামান্য কথা ভেবে তোমারও কেন স্বার্থপর হয়ে উঠবে?

আমাদের মাপ করুন সাহেব!

সাহেব পাইপে দীর্ঘ টান দেন, পাদ্রীসাহেবকে আমি যদি

এ-সব কথা জানাই, তিনি খুবই দুঃখিত হবেন—তোমাদের অকৃতজ্ঞ-তার পরিচয় পাবেন ভালো করেই--

আমরা আর কখনও কিছু করব না সাহেব, ওরা একটু ভয় পেয়ে যায় পাদ্রীসাহেবের নাম শুনে।

মানুষ মরে। তোমরা কফিন বানাও। লোককে স্বর্গে যেতে সাহায্য কর। পরের উপকার হয়। তা যদি না করতে চাও--কোরো না। মড়া পড়ে থাক লোকের বাড়িতে দিনের পর দিন। আমি পাদ্রীসাহেবকে জানিয়ে দিয়েই খালাস।

জেমস আর জোসেফ এগিয়ে আসে, আমরা খুব দুঃখিত সাহেব। আপনি দোষ ধরবেন না আর কখনও আমরা বেয়াদপি করব না সাহেব!

যা খুশি কর! কিন্তু কখনও ভুলো না তোমরা আমার জাত—রাজার জাত। যাও!

দিন কয়েকের মধ্যেই কিন্তু বেশ পরিবর্তন দেখা গেল জর্জ মহেন্দ্রলাল দাসের অফিসে। চারজন নতুন মিস্তিরী এল। দুজন হিন্দু। দুজন মুসলমান। জটাধর আর নটবর। আমজাদ আর আব্দুল। একজন পাকা চীনে মিস্তিরীও নাকি আসবে সপ্তাহে দুদিন। আরও ভালো করে কাজ করতে শিখিয়ে যাবে এদের সকলকে।

এক সঙ্গে কাজ করতে করতে ইচ্ছেমতো গল্প করতে পারে না আর এরা এখন। কাঠ দিয়ে পায়রার খোপের মতো ভাগ করা হয়েছে তিনখানা ঘর। আমজাদ আব্দুল এক খোপে। জটাধর নটবর একদিকে। মধু একা! অ্যালবার্টের ওপর পড়েছে মার্বল পাথরে নাম খোদাইএর কাজ। জেমস জোসেফ আর বাকি সকলে দুজন করে এক এক দিকে।

তবু এক ফাঁকে মধুর কাছে এসে দাঁড়ায় অ্যালবার্ট, এইবার একেবারে আসল কারখানা—

কী রে মধু, কেমন মনে হয় ?

যা যা, কথা বলিস না কাজের সময়।

কথা কইবার সুযোগ কোথায় ? কারখানা থেকে সোজা চলে যেতে হবে কবরখানায়।

খাতা খুলে ভুবনবাবু এগিয়ে আসে। খসখস করে কী লিখে নেয়। তারপর অ্যালবার্টকে বলে কাজে যেতে। না গেলে মাইনে কাটা যাবে।

কাজের মধ্যে এখন আনন্দ খুঁজে পায় না মধু। কারুর সঙ্গে কথা বলা যায় না। চিৎকার করা যায় না। ভাগে ভাগে আলাদা হয়ে চোরের মতো কাজ করতে মন চায় না মধুর। অ্যালবার্টের বলা কথাটাই বার বার মনে পড়ে, কারখানা থেকে সোজা চলে যেতে হবে কবরখানায়।

যদিও মধু হিন্দু আর কবরখানায় কোনোদিনও তার যাবার কথা নয় তবুও সেখানকার কথা ভাবে সে। কেন ভাবে কে জানে।

এখান থেকে কবরখানা একেবারেই দূরে নয়। একটু হেঁটে সার্কুলার রোড পার হলেই কবরখানার বড় গেট।

॥ ছয় ॥

রবিবার সকালে যখন সকলে গির্জে যায় তখন বিজলী অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে একদিকে বসে। দশ আজ্ঞার মানে বুঝিয়ে দেয়।

ফাদার হোমস তাকে কিছুদিন হল এই কাজ দিয়েছেন। এর জন্যে হাত পেতে পয়সা নিতে মাথাটা একেবারে নিচু হয়ে যায় বিজলীর। কিন্তু উপায় কী। সংসারের কথা ভেবে মাইনে নিতেই হয় তাকে।

দশ আজ্ঞার এক আজ্ঞা প্রথমে নিজে ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করে বিজলী। তারপর যতদূর সহজ করে পারে ছোট ছেলেমেয়েদের বোঝায়। প্রশ্ন করে। ওদের প্রশ্ন করতে বলে। আরও সোজা করে তোলবার চেষ্টা করে তার কথার অর্থ।

তোমার প্রতিবাসীকে ভালোবাসিও।

প্রতিবেশী কে? তোমাদের পাড়ার লোক। তাদের ভালোবাসবে।

তোমাদের জানাশোনা মানুষ যারা, তাদের দুঃখ বুঝবে—তাদের দুঃখের ভাগ নেবে। সকলকে ভালোবাসবে।

ছেলেমেয়েরা মন দিয়ে শোনে। মুখ দেখে মনে হয় সকলেই মানে বুঝেছে—সকলেই এই আজ্ঞা মেনে চলবে।

ওরা চলে যাবার পরেও বিজলী চুপ করে সেখানে বসে থাকে কিছুক্ষণ। ভাবে। মনে মনে বলে যেন সে নিজেও সকলকে ভালোবাসতে পারে।

আর তখন তার মধুর কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে কারণ সেও তো তার প্রতিবেশী। সে আসে বিজলীর কাছে প্রাণের টানে। প্রতিবেশী বলেই। কিন্তু তখন কেন তবে সকলে বাধা দেয়? কেন দশ আজ্ঞার বড় আজ্ঞা অমান্য করে!

আজকের কথা নয়। তখন ললিত আসে নি। মধু আসত শ্যামুয়েলের সঙ্গে। সুখ দুঃখের গল্প বলত বিজলীকে। তার কথাও শুনত।

বসন্তর রাগ হত। সরলা বারণ করত অত কথা বলতে। তবু বিজলী থামে নি। মধুকে প্রতিবেশীর সম্মান দিয়েছিল। তখন এত ভালো করে এই আজ্ঞার অর্থ বুঝতে পারে নি কিন্তু বিজলী।

আজ বোধ হয় বুঝতে পারে। তাই মধুর কথা বার বার মনে পড়ে। সে যে ভিন্ন জাত—এ-কথাটা বড় হয়ে থাকে না আর বিজলীর মনে।

বইপত্র গুছিয়ে রাস্তায় বার হতেই মধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ছুটির দিনে সেজেগুজে কোথায় চলেছে মধু। খুব তাজা দেখাচ্ছে ওর চেহারাটা।

কোথায় যাও মধু?

বিজলীর কথা শুনে লজ্জা হয় মধুর। বলতে পারে না যে তারই খোঁজে এদিকে এসেছিল। কয়েকদিন দেখা হয় নি বলে জানতে চায় সে কেমন আছে। কিন্তু কথা আসে না মধুর মুখে।

মধু তাকিয়ে থাকে বিজলীর মুখের দিকে। যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে সে। প্রাণ সঞ্চারের আনন্দের ভাগটাও যেন মধুর একার। আরও তাজা হয়ে ওঠে তার চেহারা।

অনেক দিন দেখা নাই তোমার। কেমন আছ বিজলী?

খুব ভালো। তুমি?

মধু হাসে। হাসি দেখেই বিজলী বুঝে নেয় সে-ও খুব ভালো আছে।

আসলে মধু হাসে কিন্তু অন্য কারণে। বিজলীর এই পরিবর্তনে উল্লসিত হয়ে ওঠবার কথা বইকি তার। সে না থাকলে—তাকে সান্ত্বনার কথা না বললে মাথাটা এতদিনে বোধ হয় পুরোপুরি খারাপ হয়ে যেত বিজলীর।

মধু জানে, সে ছাড়া এখন বিজলীর আপনার জন আর কেউ নেই। তার যা কিছু সুখ-দুঃখের কথা মন খুলে সে শুধু তারই কাছে বলে। আজ বিজলী যে আবার সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলছে—কাজ নিয়ে মেতে উঠেছে—সংসারে মন দিয়েছে—সে তো মধুরই জন্যে।

চল হাঁটি, বিজলী বলে, দুপুর বেলা সাহেবের সঙ্গে যেতে হবে বারুইপুরে।

সেখানে যাবে কেন ?

কার অসুখ করেছে। আমি সঙ্গে যাব সেবা করতে।

মধুর মুখটা বিষণ্ন দেখায়, কবে আসবে আবার ?

আজই রাতে, বিজলী হেসে বলে, অমন কত যাই আমি। সকালে গিয়ে রাতে ফিরি। গরিবদের সাহেবরা বড় ভালোবাসে জান মধু। সারা রাত জেগে মাথার কাছে বসে থাকে কত জায়গায়। আমি দেখে অবাক হয়ে যাই।

কথা বলতে বলতে বিমর্ষ হয়ে যায় বিজলী। মাথা নামিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে সে পথ চলে। সাহেবের সেবা করবার কথাটা জোর দিয়ে মধুকে শোনাতে হঠাৎ যেন তার বেধে যায়।

মধু তো সেবা পাবে না সাহেবের। বিপদে আপদে কোনো সাহায্যও যাবে না তার কাছে।

ধর্মটা ভিন্ন মধুর। ভিন্ন ধর্মের লোক প্রতিবেশী হলেও ভালো-বাসা যায় না তাকে। বাইবেলে একথা লেখা নেই কিন্তু সাহেবের কথাবার্তায় বিজলী বুঝে নেয়।

তাদের দৈন্য ঢাকতে মধুর ওপর আরও বেশি দরদ জাগে বিজলীর, চলো মধু ওই গাছের ছায়ায় বসি একটু। কাজ আছে নাকি তোমার কোনো?

না না, কিছু কাজ নাই, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পার্ক সার্কাস ট্র্যাম ডিপোর কাছে ছোট পার্কটায় বিজলীর সঙ্গে মধু ঢুকে পড়ে।

সাবধানে চলতে হয় দুজনকে। পার্কটাকে যেন কবরখানা বানানো হয়েছে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে। বোমা পড়লে এই সব গর্তে লুকিয়ে থাকাই নিয়ম।

জল আসে না বটে বিজলীর চোখে কিন্তু গলাটা কেমন ধরে যায়, যুদ্ধ কবে থামবে মধু?

বিজলীর প্রশ্ন শুনে মধু চমকে যায়। কোথা থেকে আবার তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় ললিত। সে বুঝতে পারে না কেন বিজলী এ প্রশ্ন করে। শীত লাগে মধুর। চেহারাটা ম্লান দেখায়।

শীত আসতে খুব বেশি দেরি আর নেই বটে। বাতাসটা ঠাণ্ডা হয়ে উঠছে দিনে দিনে। সূর্যের তেজও কম মনে হয় আজকাল। তবু যুদ্ধের ভয়ঙ্কর স্পর্শ লেগে আছে সব জায়গায়। রাস্তায়। পার্কে। সংসারে। আর প্রত্যেকটি মানুষের মনে।

মধুর কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে বিজলী নিজেই বলে আবার, মারামারি কাটাকাটি করে ক্লান্ত হয় না কেন মানুষ?

মধু বলে, এইবার যুদ্ধ থেমে যাবে, বিজলীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সে নিজেও বুকে অনেক জোর পায়। বেদনাবোধের সঙ্গে বেঁচে থাকবার ইচ্ছেটাও প্রবল হয়ে ওঠে।

তোমার মা কেমন আছে মধু?

মধু হাসে, আছে ভালোই। তবে ভয়ে ভয়ে সারাদিন থাকে বলে বড় খিটখিট করে। উঠতে বসতে গাল-মন্দ করে আমাকে।

দূরে তাকিয়ে থাকে বিজলী। হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। সে দেখে ঘোড়ার গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে বোমার ভয়ে মানুষ আবার পালাচ্ছে শহর ছেড়ে। মরা কি এতই সোজা। তবে মরতে এত ভয় কেন মানুষের!

অনেক মানুষ কিন্তু আসেও শহরে। বিজলী দেখে, এখানে ওখানে বসে পড়ে তারা। শুয়েও থাকে। ভিক্ষে চায়। কোথা থেকে আসে এত মানুষ।

মধু বোঝায়, বোমার ভয়ের চেয়ে আরও অনেক প্রবল ওদের ক্ষুধা। গ্রামে খাবার জোটে না তেমন। তাই আসে শহরে।

ক্ষিধে পেলে ভয় কাটে বুঝি মানুষের?

কাটে না? উল্লাসে স্বরটা জোরে বার হয় মধুর গলা থেকে, পেট না ভরলেই তো মুখভার হয় মানুষের। সাহসও বাড়ে তখন। গায়ের জোরে বাঁচতে চায়।

কিন্তু ওরা বাঁচবে কেমন করে? হাড়-বের-করা জীর্ণ মানুষগুলির দিকে চোখ রেখে বিজলী বলে, জোর আছে নাকি ওদের গায়ে?

আছে বইকি, হেসে বলে মধু, জোর না থাকলে এত দূর হেঁটে আসতে পারে কখনও? একটু চুপ করে থাকে সে। কী ভাবে। তারপর আবার বলে, গায়ে জোর না থাকলেও মনে জোর নিশ্চয়ই হয়েছে ওদের না খেতে পেয়ে। দেখ না, কেমন জোর করে ওরা ঠাঁই করে নিচ্ছে পথেঘাটে।

বিজলী দেখে। ভরসা পায়। কাঁদতে চায়। নিজের জন্যে নয়। মধুর জন্যে। যারা শহর ছেড়ে পালাচ্ছে তাদের জন্যে। যারা শহরে আসছে তাদের জন্যে। বেদনায় চোখ বুজে আসে বিজলীর।

কিন্তু আজও কেন দুঃখ পায় মানুষ। কাঁটার মুকুটের তীক্ষ্ণ কাঁটা এমন খোঁচা দিয়ে কেন বার বার এত রক্ত ঝরায়।

বৃথাই নিজের ক্রুশ নিজে বহন করেছিলেন মানবপুত্র। বৃথাই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন দুখী-দুঃখিনীর রাজা। বিশ্বমানবের দুঃখভার বয়ে বয়ে নিজেই দুঃখ পেয়ে গেলেন শুধু। এই পৃথিবীতে ভারী ক্রুশ পড়েই রইল যেমনকার তেমন।

সেই ক্রুশের বিপুল ভার দেহমন দিয়েই আজ অনুভব করতে পারে বিজলী। মধুর দিকে তাকায়। দূরের শীর্ণ মানুষদের দেখে।

মাথায় কাঁটার মুকুট। কাঁধে ভারী ক্রুশ। কপাল চিরে যাচ্ছে, দেহ ভেঙে পড়ছে, থামছে না। এগিয়ে যাচ্ছে ক্রুশমণ্ডপের দিকেই।

মন্দ লোকের কী অমানুষিক নিষ্ঠুর! দেখছে। হাসছে। ব্যঙ্গ করছে। নামাতে দিচ্ছে না ক্রুশ। সাহায্য করছে না ভার লাঘব করতে।

রোদের তেজ বাড়ে। বেলা গড়িয়ে যায়। কত সময় হল কে জানে। যদিও মধুর দুঃখের কোনো কথাই জানে না বিজলী, তবু তার জন্যে দুঃখ বোধ করে অকৃত্রিম মমতায় বুক ভরে ওঠে। স্বাদটা জানা ছিল না বিজলীর।

দিন চালাতে কষ্ট হয় না তোমার মধু?

হয় না? যা দিনকাল মধু তেমনি করেই হাসে।

আর কত কষ্ট করবে মানুষ? না না, বিজলী স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয় মধুকে, আমার কথা বলি না। কারুর ঘরেই তো খাবার নেই। ছেলেমেয়ের মুখের দিকে বাপ-মা তাকাবে কেমন করে।

কিছু জানে না কবে কী হবে, তবু বিজলীকে আশ্বাস দেবার মধ্যে আনন্দের উগ্র স্বাদ পায় মধু. না খেয়ে মরবে নাকি মানুষ? সব ঠিক হয়ে যাবে। যুদ্ধটা থামুক না একবার।

যুদ্ধটা কেউ থামিয়ে দিতে পারে না মধু? এক হুকুমে? মুখের এক কথায়?

তখুনি উত্তর যোগায় না মধুর মুখে। কথাটা নিজেও তো ভেবে দেখে নি কখনও। তাই তো, কে যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে এক কথায়।

থেমে থেমে মধু বলে, তা পারে বটে।

যারা যুদ্ধ করছে তারা ভাব করে নিলেই তো এক মিনিটে যুদ্ধ থেমে যায়।

কই আর ভাব হয় ওদের। ওরা মারামারি করে আর আমাদের চেনা লোকগুলো মরে যায়—

এই মুহূর্তে যুদ্ধ থামিয়ে দেবার অদম্য ইচ্ছায় মধুর বুক তোলপাড় করে। বিজলীর মনে যে ক্ষত আছে, বাইরে যত চিহ্ন আছে এই ভয়াবহ যুদ্ধের, লোকাতীত শক্তিতে সব লুপ্ত করে দিতে চায় মধু। তাহলে শান্তি পাবে বিজলী। ললিতের স্মৃতি থেকে থেকে বিষণ্ণ করে তুলবে না তাকে। ললিতকে হারানোর দুঃখের চেয়ে মধুর বেঁচে থাকার আনন্দটাই বড় হয়ে উঠবে তার কাছে।

বিজলীর হাত শক্ত করে চেপে ধরতে ইচ্ছে করে মধুর। মাথা বুকে টেনে নিতে মন চায়। আদরে আদরে ভালোবাসার বিপুল তোড়ে তাকে বুঝিয়ে দিতে চায় যে কোনো দুঃখ নেই পৃথিবীতে।

কিন্তু বিজলীর মুখের দিকে তাকাতে পারে না মধু। মাটির দিকে তাকায়। গর্ত খোঁড়া। মাটির ঢিবি এপাশে-ওপাশে। রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে খাকী-পোশাক-পরা লোক। হেঁটে কিংবা সাইকেলে। মোটরে কিংবা মোটর সাইকেলে। আকাশে এরোপ্লেন উড়ছে। যুদ্ধের জন্যে অনেক বেশি প্লেন ওড়ে আজকাল। শব্দে মাথা ধরে যায় মধুর। যুদ্ধের এত চিহ্ন কেমন করে এক মুহূর্তে লুপ্ত করে বিজলীর ব্যথা দূর করবে মধু!

যুদ্ধ শেষ করে দাও ভগবান!

আর হঠাৎ তখন একটানা সাইরেন বেজে ওঠে। মধুর বুক চিরে-চিরে। বিজলীর প্রাণ কাঁপিয়ে। বাজে তো বাজেই। থামে না।

বাইরে কাজ করে আনন্দ পেলে হবে কী, নিরানন্দের ছায়া ঘর থেকে কিছুতেই সরে যেতে চায় না। বসন্তর শুকনো মুখ। রেণুর ম্লান চোখ। বিজলীর মনটা দমে যায়। হাতের বই-খাতা টেবিলের ওপর গুছিয়ে রাখে। তক্তাপোশের ওপর গড়িয়ে নেয় কিছুক্ষণ।

বসন্ত স্নান করছে। কবরখানা থেকে আগেই ফিরেছে আজ। রবিবারে একটু সকাল সকাল ফেরে বটে বসন্ত। রান্নাঘরের চৌকাঠের ওপর চুপ করে বসে আছে রেণু। কী ভাবছে এক-মনে। শাড়িটা ময়লা। ছেঁড়া।

রেণুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ভয় পায় বিজলী। কার কথা ভাবছে? নিশ্চয়ই ওর স্বামীর কথা। ঠিক অমনি করে ওখানে বসে ললিতের কথা ভাবত বিজলী কিছুদিন আগে।

যদি শ্যামুয়েল আর না ফিরে আসে? ললিতের মতো তার ভাইও যদি হঠাৎ হারিয়ে যায় যুদ্ধের অন্ধকারে? সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় বিজলী। অশুভ একটা ছায়া কাঁপে ঘরের লোনা-ধরা দেয়ালে। ভয় দেখায়। তাড়াতাড়ি বিজলী এসে দাঁড়ায় রেণুর পাশে। চৌকাঠের ওপর বসে পড়ে। রেণুর রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে দেয়।

দাদা চিঠি লিখেছে রেণু?

কই না তো। দশ-পনেরো দিন আগে লিখেছিল একটা—

অমন দেরি হয়, বিজলী বলে, বড় গোলমাল হয় চিঠিপত্রের।

হোক, ঠোঁট উল্টোয় রেণু, চিঠি পড়ে দিন কাটাবার শখ নেই আর আমার। যা হয় হোক, আমি কিছু ভাবি না।

বিজলী হেসে বলে, তবে মুখ ভার করে কী ভাব তুমি এত?

ভাবি বিয়েটা করবার কী দরকার ছিল তোমার দাদার? এখন বাঁচে কি মরে ঠিক নেই। ভোগাবার জন্যে বিয়ে করে নাকি মানুষ?

বিজলী বোঝে রেণুর জ্বালা কোথায়। তবু তার ভাই যে মরে যেতে পারে সেকথা ভাবতে কষ্ট হয়। কিন্তু রেণুর কথার উত্তরে কিছু বলতেও পারে না।

রেণু গজগজ করতে থাকে, আমি আবার একটা মানুষ নাকি। তাই মা-বাপ বিয়ে দিয়েছে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে যে যুদ্ধ করে তাকে বিয়ে না করে সাদা থান পরে বসে থাকলেই তো হয়।

আঘাত পায় বিজলী। রেণুকে নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। মন্দ ভাবনা ভাবতে শুরু করলে মনটাও কড়া হয়ে যায় বোধ হয় মানুষের। অবস্থা যতই প্রতিকূল হোক, স্বামীর অমঙ্গল কামনা করা কোনো মেয়ের পক্ষেই হয়তো শোভন নয়। বিজলী একটু দূরে সরে বসে।

রান্না করা হয়ে গেছে তোমার?

হ্যাঁ, শ্লেষের সুর লেগে থাকে রেণুর কথায়, পোলাউ-কালিয়া রেঁধেছি। বিয়ের পর ওই তো কাজ আমার। শুধু হাঁড়ি ঠেলা। আরে হাঁড়িই নেই তো ঠেলব কী। কাঁকরভরা একটুখানি চাল আর কচুর ঘ্যাঁট ভাতের। মাথায় বোমা পড়ে মরলে বাঁচি এখন। স্বামীর সোহাগে আর কাজ নেই।

রান্নার কথা শুনে সরলার কথা মনে পড়ে বিজলীর। মৃত্যুর সময় মা তাকে বলে গিয়েছিল, ও মা বিজু, তোর বাবাকে দেখিস। শুধু ডালভাত খেতে দিবি না কখনও

মার কথা কেমন করে রাখবে বিজলী। মা কি জানত এমন অবস্থা হবে সংসারের। রেণুর বিরক্তির কারণ এতক্ষণ পর বিজলী যেন খুঁজে পায়। স্বামী যুদ্ধে। অভাবের সংসার। রাগ তো হবেই রেণুর।

তার পিঠে হাত দিয়ে সে বলে, মেলাটাও আর হল না রেণু। খোলা জায়গায় লোকের ভিড় হওয়া ঠিক নয় এখন

আমি আগেই জানতাম। কিছু হবে না। কোনো সাধ-আহ্লাদ করা হবে না।

সব হবে রেণু। একটু সবুর কর, বিজলী ম্লান হাসে, যুদ্ধটা থামুক—

হুঁঃ, মুখ দিয়ে ব্যঙ্গের শব্দ করে রান্নাঘরের ভেতরে চলে যায় রেণু। তারপর টেবিলের ওপর থালা সাজায়। কলাই-করা থালায় কাঁকরভরা লাল চালের ভাত।

খেতে বসে বসন্ত বলে, তুমিও খেতে বস রেণু। বেলা হল অনেক।

ততক্ষণে একটা পান মুখে পুরেছে রেণু, আমার খাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

বিজলী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রেণুর মুখের দিকে।

বসন্ত গম্ভীর হয়ে যায়। রেণুর আগে খাওয়া সেরে নেওয়াটা বোধহয় ভালো মনে গ্রহণ করতে পারে না।

একদিন থালা ঠেলে রেণুর ওপর অকারণে রেগে না খেয়ে উঠে গিয়েছিল বলে চোখের জল পড়েছিল বসন্তর কবরখানায়। সে বুঝেছিল কোনো দোষই ছিল না রেণুর। শুধু শুধু মেয়েটাকে আঘাত দিয়েছিল। তারপর থেকে একটু বেশি কোমল স্বরেই রেণুর সঙ্গে কথা বলে। তাকে কাছে ডাকে। আদর করে। পাশে বসে খাওয়ায়। নিজের ভুল শুধরে নেয় অসীম দরদে।

আজ আবার হঠাৎ রেগে ওঠে বসন্ত, এত খিদের তেজ কেন তোমার? একটু সবুর করলে চলত না?

শ্বশুরের কর্কশ স্বর শুনে পান-রাঙা ঠোঁট কাঁপে রেণুর। কথা বলে না। দরদর করে জল পড়ে চোখ দিয়ে। মোছে না। সরে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদে সেখানেই।

সন্দেহের দৃষ্টিতে বিজলী অনেকক্ষণ দেখে রেণুকে। কখন খেল সে? খেল কী? চাল তো ছিল মোটে এক কৌটো। তাতে খাওয়া হয় নাকি সকলের!

বসন্তকে যেন এক নিশ্বাসে বলে বিজলী, রেণু খায় নি বাবা। মিথ্যে কথা। আমাদের পেট ভরে খাওয়াবার জন্যে নিজে উপোস করে আছে—

বসন্তর মুখটা ফাঁক হয়ে যায়। ছটফট করে। বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে করে মেয়েটাকে। অদ্ভুত আনন্দের স্বাদ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়ে দেয়।

ওরে বিজু, ওর চোখের জল মুছিয়ে দে। ওকে খাওয়া— আবেগে স্বর বন্ধ হয়ে আসে বসন্তর।

বিজলী রেণুর চোখের জল মুছিয়ে দিতে ওঠে। তাকে সরিয়ে দেয় রেণু। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদে। তবু ওকে ধরে থাকে বিজলী।

ক্রুশ তোলাই আছে কাঁধে। কিন্তু নিজেকে অস্বীকার করার সাধ চলে যায় বিজলীর। সংসারের এই মধুর ভাগ ছেড়ে যেতে মন চায় না।

কাঁধের ভারী ক্রুশটাও হঠাৎ যেন হালকা হয়ে যায়। সকাল-বেলার সেই কথাটাই মনে পড়ে আবার, তোমার প্রতিবাসীকে ভালোবাসিও।

॥ সাত ॥

দাঁতে দাঁত লেগে যায় মধুর। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে এবার কলকাতায়। গরম জামা-কাপড় কিছুই নেই বলে হয়তো আরও বেশি শীত লাগে। একটা পুরনো চাদর শুধু। অনেক কষ্টে কালীতারা জোড়াতালি দিয়ে দিয়েছে। এতেই চালাতে হবে। না হলে চলবে কেন। গরম জামা-কাপড় কেনবার পয়সা কোথায়। শীতে মরে গেলেও কিছু করবার নেই এ বছর।

এমন কিছু রাত হয় নি। কিন্তু কী শীত! আজ বড়দিন। বসন্তর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সেরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরছিল মধু। আর একটু আগেই ফেরা উচিত ছিল। খালি ঘরে একা থাকতে সন্ধ্যেবেলা ভয় লাগে কালীতারার। ছেলের জন্যে ভাবনাও ধরে। মার কথা মনে করেই বাড়ির দিকে তাড়াতাড়ি পা চালায় মধু।

বছর বছর বড়দিনে এখান-ওখান থেকে ডাক আসে মধুর। বেশ নতুন ধরনের রান্না। খেতে মন্দ লাগে না। মাংস পোলাউ। কমলালেবুর পায়েস। আর সকালে-বিকেলে কোথাও গেলে নতুন বছরের দিন অবধি কেক কমলালেবু আর চা। সকলেই দেয়। খেতেই হয়। না খেলে জোর করে খাওয়ায় ওরা।

তখন ওদের সঙ্গে সব ভুলে আনন্দ করে মধু। মনে হয় শীতকালেও পুজো চলছে যেন। উৎসবের খুশিতে আন্তরিকতাও বেড়ে ওঠে।

এবার কিন্তু বড়ই দুঃসময়। কেউ আর ডাকে না মধুকে।

মুখ ফুটে কিছু বলে না বড়দিনের কথা। চাল নেই। মুরগির দাম চড়া। পয়সাই নেই তো উৎসবে ঘটা হবে কেমন করে।

কিছু চাল যোগাড় করেছিল মধু। ভয়ে ভয়ে বিজলীকে জিজ্ঞেস করেছিল, কিছু চাই কিনা।

কথা শুনে হেসেছিল বিজলী। বলেছিল, কী দিতে পারে মধু!

মধু তখন সাহস পেয়ে ডিম মাংস আর চাল চুপেচাপে তুলে দিয়েছিল বিজলীর হাতে।

সে কথা বলে নি। হাত বাড়িয়ে সব কিছুই নিয়েছিল মধুর কাছ থেকে। দৈন্যের চেয়ে উৎসবের কথাটাই তখন বোধ হয় বড় হয়ে উঠেছিল তার কাছে। মিলেমিশে থাকলে অভাবেও উৎসব বন্ধ হয় না মানুষের।

তাই সন্ধ্যেবেলা মধুকে খেতে বলেছিল বিজলী। রেণু আর বসন্তও জোর দিয়েছিল কথায়, আসতেই হবে। সাইরেন বাজুক—বোমা পড়ুক—কোনো আপত্তি চলবে না মধুর। সে না থাকলে নাকি বড়দিন বলে মনেই হত না আজ।

সরলার নামও দু-একবার করেছিল বসন্ত। চোখ দুটো সজল হয়ে উঠেছিল তার। সারাদিন কেটেছে আজ কেঁদে কেঁদে কবর-খানায়। তবু মধুর হাত চেপে ধরে বলেছিল, তোকে আসতেই হবে রে মধু!

মধু গিয়েছিল ঠিক সময়। অন্ধকার হবার আগেই। পাতলা রঙিন কাগজের শিকল ওরা ঝুলিয়েছে ঘরে। ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রেখেছে চারপাশ। নতুন কাপড় পরবার ক্ষমতা হয় নি বটে কারুর, কিন্তু এতটুকু ময়লা নেই কোথাও।

ঘরে ঢুকে হাসে মধু। দু-একজন আত্মীয় এসেছে এদের। রেণুর বাবা যত্ন গোমেজ ধুতি-কোট পরে গল্প জুড়েছে বসন্তর সঙ্গে। তার স্ত্রী রান্নার সাহায্য করছে বিজলী আর রেণুকে। রান্নার গন্ধ নাকে নতুন লাগে মধুর।

তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে সব। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলেই বাড়ি ছুটতে হবে। যদিও অন্ধকারের ভয় আজ একেবারেই নেই, ফুটফুটে চাঁদের আলো আছে বাইরে, কিন্তু যা দিনকাল! কখন কী বিপদ ঘনিয়ে আসে ঠিক কী!

কথা বলতে বলতে চমকে চমকে ওঠে যদু গোমেজ। কানে একটু কম শোনে বোধ হয়, কেউ বাঁশি বাজালেও ভাবে সাইরেন বাজছে।

যদু গোমেজ, বসন্ত আর মধু আগে খাওয়া সেরে নেয়। মেয়েরা পরে খাবে। এক টেবিলে জায়গা হয় না সকলের। খেতে খেতে কথা বলে না কেউ। কথা আর নেই। সেই দুঃখদুর্দশা আর যুদ্ধের কথা। সে তো অনেক বলা হয়েছে। ওরা খাওয়ার দিকেই বেশি মন দেয়। মধুও।

কিন্তু তবু মধুর সঙ্গে কথা থাকে বিজলীর। যুদ্ধের দুর্দিনের কথা নয়। একেবারে অন্য কথা। সকলে চলে যায়। কিন্তু মধুকে আর কিছুক্ষণ থাকতে বলে বিজলী।

যেতে যেতে যদু গোমেজ থমকে দাঁড়ায়। বিজলী আর মধুকে দেখে। আড়ালে বসন্তকে বলে মধুকে দীক্ষা দিয়ে বিজলীর সঙ্গে বিয়ে দিতে। ছেলেটি তো ভালোই। বিজুর ওপর টানও তো খুব।

বসন্ত গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, বিজুকে বিয়ের কথা বলতে সাহস হয় না তার। আর যদু গোমেজকেও সাবধান করে দেয়, এসব কথা সে যেন কখনও কারুর সামনে না তোলে।

ঘুরেফিরে আবার সেই যুদ্ধের কথা এসে পড়ে। বসন্ত বলে, বিজু যাকে বিয়ে করবে ঠিক করেছিল সে তো মরে গেল যুদ্ধে। কিন্তু কেউ মরে না বলেই ললিত আজও বেঁচে আছে বিজলীর মনে। দু বার বিয়ে করতে তাকে কেমন করে বলবে বসন্ত।

আড়ালে কথা বললেও ওদের সব কথাই শুনতে পায় মধু। কালা কিনা যদু গোমেজ তাই বসন্তও তার সঙ্গে সমানে চেঁচায়।

কথা শুনতে ভালো লাগে মধুর। কিন্তু বসন্তর যুক্তি ঠিক সমর্থন করতে পারে না। দু বার বিয়ে মানে? কবে আবার ললিতের সঙ্গে বিয়ে হল বিজলীর? মাথাটা সত্যি খারাপ হয়েছে বটে বসন্তর। কী হয়েছে আর কী হয় নি কিছুই মনে থাকে না।

উঠোনে মধুকে ডাকে বিজলী। বেণু বাসন সাজিয়ে রাখছে। বসন্তর চোখ ঢুলে আসছে ঘুমে। মধু এসে বসে বিজলীর পাশে। হাওয়ার জোর আছে। তবু ওরা বসে থাকে বাইরে।

চাদরটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নেয় বিজলী, নিজেদের কথা ভাবি স্বার্থপরের মতো, তোমার কথা ভাবি না। তুমি এখন চাল পাবে কোথায়?

পাব ঠিক, পান চিবোয় মধু, বড়দিনে আমোদফুর্তি বন্ধ থাকবে নাকি তোমাদের?

কিন্তু পয়সা যে খরচ হল তোমার অনেক। নিজে করবে কী?

আমার জন্যে তোমার কোনো ভাবনা নাই। আমি চালিয়ে নিতে পারি ঠিক।

মা যে আছেন তোমার?

বিধবা মানুষের কোনোই খরচ নাই, একটা দেশলাই-এর কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচায় মধু, মিছামিছি ভাবনা কোরো না বিজলী। মাস ফুরিয়ে এল। আর তো মোটে কয়টা দিন—।

বড়দিনের সন্ধ্যায় নিজেকে বোধ হয় ক্ষমা করতে পারে না বিজলী। মধুর জন্যে কোনো ভাবনা এতদিন সে করে নি বটে। আশ্চর্য! সে হঠাৎ নিজের মধ্যে এক স্বার্থপর মানুষকে আবিষ্কার করে অস্বস্তি বোধ করে।

বিজলী মধুকে এতদিন শুধু নিজের দুঃখের কথা বলেছে। স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করেছে। তার কোনো কথা শোনে নি। তার দুঃখ বোঝে নি কোনোদিন। এত নিষ্ঠুর কেমন করে হতে পারল সে! শুধু শোনায়, কিন্তু শোনে না। শুধু নেয়, কিন্তু দেয়

না। নিজেকে নিয়ে যে মেতে থাকে সে স্বার্থপর। বিজলী ভাবে, সে-ই বোধ হয় সবচেয়ে বড় স্বার্থপর।

তুমি আমার ওপর রাগ কর মধু?

চমকে উঠে মধু বলে, কেন?

তোমার দুঃখ বুঝি না। তোমার কথা শুনি না। তোমার সঙ্গে সব সময় স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করি। আমার ওপর তো রাগ হওয়ারই কথা তোমার?

বিজলীর কথার অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে দিশেহারা হয়ে মধু বলে, কী বল তুমি বিজলী? তোমার কথা বুঝি না।

ম্লান হাসে বিজলী, তুমি আমার সুখ-দুঃখের কথা শোন। আমাদের সকলের জন্যে ভাবনা কর। কিন্তু আমরা তোমার জন্যে কিছুই তো করি না মধু।

কথা বলতে পারে না মধু। শীতে কাঁপে। কিন্তু তবু এখান থেকে উঠে যেতে ইচ্ছে হয় না। সে বিজলীকে বলতে চায় যে সে তার জন্যে কিছুই করে না একথা ঠিক নয়। মধু কাউকে বলতে পারে না তার জন্যে কী করে বিজলী। এমন একটা-কিছু সে করে যা দেখা যায় না, শোনা যায় না। শুধু বোঝা যায়। মধু তা বোঝে বলেই তার কাছে আসে। না এসে থাকতে পারে না বলেই আসে। কিন্তু সব কথা বিজলীকে বুঝিয়ে বলবার ভাষা খুঁজে পায় না মধু।

কেন বিজলীর জন্যে তার এত ভাবনা সেকথা সুস্পষ্টভাবে মধু নিজেও বুঝতে পারে না। সামনে এলে সে নিজে সব কিছু একেবারে ভুলে যায়। শুধু বিজলীর কথাই শুনতে ইচ্ছে করে। তাই চুপ করে থাকে মধু। বিজলীর কথার উত্তর দিতে পারে না।

বিয়ে করবে না মধু?

তবুও মধু উত্তর দেয় না। লজ্জায় মাথাটা নিচু হয়ে যায়।

ওই তো তার দোষ। সুযোগ পেয়েও মনের কথা সে বলতে পারে না। এখন তো সে বিজলীকে সোজা বললেই পারে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবার কথা ভাবতে পারে না সে। তাকে বিয়ে করবে বলেই এতদিন ধৈর্য ধরে বসে আছে। এখন বলুক বিজলী, কবে বিয়েটা চুকিয়ে ফেলতে রাজী সে।

কী ভাবে মনে মনে মধু কে জানে। এসব কথা বলা হয় না তার বিজলীকে। পাছে বিজলী তাকে স্বার্থপর ভাবে, মনে করে তাই তার সুখ-দুঃখের কথা জানবার জন্যে এত গরজ মধুর এই ভাবনায় মধু মুখ বুজেই থাকে।

তোমার মা বিয়ের কথা বলে না তোমায়?

বলে। আমি শুনি না সে-সব কথা

কেন? কত ভালো মেয়ে আছে তোমাদের সমাজে

রেগে যায় মধু, আমার কী তাতে? আমি তাদের চিনি না, তাদের দেখি নাই কখনও।

চুপ করে যায় বিজলী। মধুর মনোভাব বোঝা কঠিন হয় না তার পক্ষে। দ্বন্দ্বে মন ভরে যায়। নিজেকে দুর্বল মনে হয় বিজলীর। অসম্ভব কথা ভাবে। শ্যামুয়েলের কথা মনে পড়ে। মধুর মার শুকনো মুখটাও ভেসে ওঠে চোখের সামনে। তবু যন্ত্রণা আর সমবেদনা ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

অনেকক্ষণ বসে থাকে ওরা দুজন। কথা নেই কারুর মুখে।

ঘরে ঢুকতেই কালীতারার উগ্র মূর্তি চোখে পড়ে মধুর। বুড়ি আজ মেরেই বসবে বোধ হয় ছেলেকে। কপালটা কুঁচকে গেছে কালীতারার। চোখও বড় হয়েছে বেশ। নিশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে।

সরে যা। এই মধু, সরে যা বলছি। খবরদার আমাকে ছুঁবি না মুখপোড়া ছেলে। অজাত-কুজাতের সঙ্গে মাখামাখি করে রাত বারোটায় মায়ের কথা মনে পড়ল তোর?

রাত বারোটা বাজে নাকি এখন? কী যে বল মা! এই তো সবে সন্ধ্যে হল।

তোর মুণ্ডু হল, যতদূর তোলা যায় গলার স্বর ততদূর তুলে কালীতারা চিৎকার করে, ঠিক করে বল তুই নিয়েছিস কিনা আমার চাল? খাঁদুব পিসির কাছ থেকে পাঁচ সের আতপ চাল চেয়ে-চিন্তে নিয়ে এলাম—খুঁজে খুঁজে হয়রান! চাল উড়ে গেল নাকি ঘর থেকে। বল ঠিক করে মধু? চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কালীতারা।

মার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে যায় মধু। ভাবে, সত্যি কথাটা বলা হবে না কিছুতেই। সে যে চাল দিয়েছে বিজলীকে আর তা দিয়েই বড়দিনের উৎসব করেছে ওরা—একথা শুনলে হয়তো তাকে মেরেই বসবে কালীতারা।

মাকে দেখে দুঃখ হয় মধুর। শুধু নিজে খাবার জন্যে চাল যোগাড় করে আনে নি বুড়ি। মধুকে যত্ন করে খাওয়াবার কথাই ভেবেছিল বোধ হয় সবচেয়ে আগে। কালীতারা আর কতটুকু খায়। সেকথা মধু বুঝতে পেরেছে বলেই ভাগাভাগি করে খেয়েছে সে চাল ওদের সকলের সঙ্গে। মা বাধা দেবে ভেবে তাকে আগে জানায় নি কিছু।

ছেলেকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ বাড়ে কালীতারার। হঠাৎ চেহারাটা বদলে যায় বুড়ির। সমস্ত শরীরও যেন কঠিন হয়ে যায়। সে এগিয়ে এসে মধুর পিঠে জোরে আঘাত করে।

বল? কথার জবাব দে? কাকে তুই দিলি আমার চাল?

সাহস বাড়ে মধুর। একটু হাসে। মার দিকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই তাকিয়ে বলে, আমিই খেয়েছি মা।

ঠিক করে বল মধু, কর্কশ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে কালীতারার গলার স্বর, না তুই খাস নি, আমার মুখের গেরাস কেড়ে হাভাতে খিষ্টানদের বিলিয়েছিস—

মধু বলে, তুমি আর কতটুকু খাও? ওদের না দিলে বড়দিনে খাওয়াই জুটত না ওদের—

ছেলেকে জোরে জোরে মারে কালীতারা। চোখ থেকে দর-দর করে জল গড়িয়ে পড়ে, বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার চোখের সুমুক থেকে হারামজাদা ছেলে—এতবড় চোর হয়ে উঠেছিস তুই যে আমার মুখের ভাত চুরি করে ওদের খাওয়াস? ওগো কোথায় গেলে গো? একবার এসে তোমার বেটার দরদ দেখ গো! হরি আমায় মারো—হেই ভগবান আমায় মারো—ঠাকুর বোমা ফেলো আমার মাথায়! কেউ নাই আমার এ সংসারে! যা যা দূর হয়ে যা, চিৎকার করে কাঁদে কালীতারা অনেকক্ষণ।

মা, ও মা, তবু মধু ডাকে। শান্ত হতে বলে মাকে। অনেক বোঝায়। লজ্জাও হয় তার নিজের। মা হয়তো মনে করেছে ওদের ওপর বেশি টান মধুর।

চুপ কর। কথা কস না আমার সাথে। তোকে পেটে ধরি নাই আমি। তুই গলা কাটতে পারিস আমার--বুড়ি কাঁদে আর চেঁচায়।

ও মা থামো। রাত-বেরেতে কাঁদে না এমন। আমি চাল এনে দেব তোমার। দিব্যি করে বলছি -

চুপ কর মধু--চুপ কর। কথা কস না আমার সাথে তুই, মুখে বুড়ি একথা বলে বটে কিন্তু নিজে চুপ করে না, তুই চাল খাওয়া ওদের। গলাগলি-ঢলাঢলি কর তাদের সাথে। আমি বিষ খেয়ে মবি এখানে। এমন ছেলেকে নিয়ে বাস করি -কী পাপ করেছিলাম ঠাকুর –

এত জোরে কথা বললে পাড়ার লোকের কৌতূহল জাগতে পারে মনে করে মধু বিরক্ত হয়। বুড়িকে জোর করে থামিয়ে দিতেও সাহস পায় না। মধু যত চুপ করতে বলবে, কালীতারা ততই চেঁচাবে, সে-কথা মধু জানে। তাই সে নিজেই চুপ করে

থাকে। বুড়ি আর কথা বলে না বটে, মাটিতে বসে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। মধু গড়িয়ে পড়ে ভাঙা খাটিয়ার ওপর।

বুড়ি থামে না। মধুরও ঘুম হয় না। রাত বাড়ে। শব্দ করে মিলিটারি ট্রাক যায় দূরে বড় রাস্তার ওপর দিয়ে। মধু অস্বস্তিতে খাটিয়ার ওপর ছটফট করে।

কালীতারা চুপ করে এক সময়। কী ভেবে একটু ভয় পায়। ভীত স্বরেই আপন মনে বলে, আমি কিছু বুঝি না ভাবিস? তোকে জাদু করেছে। বশ করেছে। ডাইনি ও। ওরা সব পারে। ইস, ছেলেকে ছিনিয়ে নেওয়া সোজা নাকি অত? মায়ের বাড়ি গিয়ে মানত করব আমি। ডাইনির ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারো মা!

আবার উঠে বসে মধু, গরিব হয়ে গরিবকে অভিশাপ দিতে নাই মা। চাল চায় নি ওরা। আমিই জোর করে দিয়েছিলাম—

পাত্রী নাই ওদের? তুই দেবার কে রে বে-আক্কেলে ছেলে? তোর অন্ন মারে—পাত্রী তোকে দেবে যুদ্ধের বাজারে চালডাল? মুখে লাথি মারবে তোর!

জানি না, দৃষ্টি কোমল হয়ে ওঠে মধুর, ওরা কিন্তু সব দিতে পারে জানি। গরিব তো গরিবকেই দেখে চিরকাল।

মধুর কথার এতটুকু অর্থ না বুঝে আবার চিৎকার করে ওঠে কালীতারা। যারা তার ছেলেকে বশ করেছে তারা যে শিগগির উচ্ছন্নে যাবে সে কথাটা গলার জোরে মধুকে আর একবার জানিয়ে দেয়।

মাকে শুয়ে পড়বার জন্যে মিনতি করে মধু। ঘড়ি না থাকলেও বুঝতে পারে রাত অনেক হয়েছে। ভারি ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। আর কতক্ষণ শীতে কাঁপবে কালীতারা। অসুখে পড়লে মধুর দেখাশোনা করবে কে।

মধুর জন্যে ভাবনা করতে ইচ্ছে হয় না কালীতারার। এমন

অকৃতজ্ঞ ছেলের হাত এড়াতে পারলে সে বেঁচে যায়। রূঢ় ভাষায় এসব কথা মধুকে কালীতারা শোনায়।

কিন্তু কথা শেষ হয় না, বুড়ি লাফিয়ে ওঠে। মধুও উঠে দাঁড়িয়েছে। সাইরেন বাজছে। নিস্তব্ধ রাতে আওয়াজ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। যদিও সাইরেন বাজলে আর ভয় লাগবার কথা নয় কারুর, রোজই তো অমন কতবার বাজে। কিন্তু বেশি ঠাণ্ডায় রাত নিঃঝুম হয়ে আছে, হিমের মতো ভয়ও যেন ছড়িয়ে আছে চারপাশে। তাই সাইরেনের আওয়াজ নতুন বলেই মনে হয় মধুর। বুকটা ওঠানামা করে বার বার।

ভয় নেই শুধু বোধ হয় সিভিক গার্ডদের। এ. আর. পি-র লোকদের সঙ্গে ওরা সমানে ছুটোছুটি করে রাস্তায়। জানলা ফাঁক করে মধু সবই দেখতে পায়। বাইরে ফুটফুটে চাঁদের আলো। ওদের দেখতে অসুবিধা হয় না তার।

মধুর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে দু-তিনজন। দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে জোর গলায় বলে, এখানে থাকা চলবে না কারুর। পাশের বড় পাকা বাড়িটায় এখুনি চলে যেতে হবে ওদের সঙ্গে। জোরে জোরে দরজা ধাক্কা দিয়ে ওরা জানতে চায় মধু কথাটা শুনতে পেয়েছে কি না।

দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে মধু বলে, কী হবে আজ? এত ছুটোছুটি করছে কেন ওরা হঠাৎ?

শত্রুর প্লেন এসে গেছে। বোমা পড়তে পারে কলকাতা শহরে।

কেঁদে ওঠে কালীতারা। কে বলবে মরবার জন্যে বুড়ি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল একটু আগে। কালীতারা শক্ত করে মধুকে ধরে রাখে। ছাড়ে না।

ওরা এসে ওঠে পাশের বড় পাকা বাড়ির একতলায়। ঘর ছেড়ে আসবার আগে ভালো করে দরজা বন্ধ করবার অবসর পায়

না। ঘর খোলাই থাকে। চোরের ভয় নেই আজ আর। বাঁচবে কিনা কে জানে। পার্থিব জিনিসের ওপর আকর্ষণ কমে যায়। গৃহস্থ কিংবা চোর—সকলের।

কালীতারার সঙ্গে পাশের পাকা বাড়িতে ঢুকে মধু দেখে পাড়ার আরও অনেকে তাদের আগে সেখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ঘর ভরে গেছে একেবারে। কিন্তু মুখে কথা নেই কারুর। নিরাপদ আশ্রয়ে এসেও মৃত্যুভয় কমে নি একটুও।

রাস্তার ওপরেই পাকাবাড়ি। বাইরে চারপাশ ঘিরে পুরু দেয়াল তোলা হয়েছে। এমন করে রাখলে নাকি বোমা পড়লেও বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা। তবু ভয় কাটে না কারুর। কেউ কথা বলে না।

শুধু মধুর কাছে মৃত্যুভয় তুচ্ছ হয়ে যায় হঠাৎ। অন্ধকার ঘরের এপাশে-ওপাশে তাকায় সে। বিজলীর নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে ইচ্ছে করে। কে জানে কেউ তাদের খবর দিয়েছে কিনা, অন্য কোনো জায়গায় তারা আশ্রয় নিয়েছে কিনা।

যেন কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই, যেন কিছুই ঘটবে না এই মুহূর্তে রাস্তায় বার হলে। মধুর ইচ্ছে করে একছুটে বিজলীর বাড়ি গিয়ে খবরটা নিয়ে আসতে।

কিন্তু ওঠবার উপায় নেই মধুর। কালীতারা তাকে শক্ত করে ধরে ভয়ে কাঁপছে। তার হাত জোড় করে ছাড়িয়ে বাইরে যেতে চাইলে চিৎকার করে কেঁদে পাড়া মাতিয়ে তুলবে। তাই অস্বস্তিতে মধু ছটফট করে। নিরাপদ আশ্রয়ে এসেও নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

একটু পরেই সেই ঘরে এসে ঢোকে বিজলী। সঙ্গে বসন্ত আর রেণু। প্রাণের ভয়ে কথা নেই ওদের মুখে। ঘরে ঢুকেই ওরা বসে পড়ে। মরতে হবে বলে কে যেন কাঁদছে। বিজলী সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

মধু উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমিও এখানে আছি—

আরে, আশ্চর্য। বিজলী হাসে, ঘুমবার উপায় নেই। রাত-বিরাতে ছুটোছুটি।

ওরে মধু, উঠিস না বোস—কালীতারা গায়ের জোরে ছেলের হাত টানে।

বিজলী এসে বসে পড়ে কালীতারার পাশে। তখন মধুকে ছেড়ে কালীতারা বিজলীকেই শক্ত করে ধরে। যেন কোনো রাগ তার নেই বিজলীর ওপর, যেন তার পক্ষে এখন বাঁধন আলগা করা একেবারেই অসম্ভব।

বিজলী ভয় পায় নি দেখে মধুরও ভয় কেটে যায়। মরতে আর ভয় নেই তার। দুজনে একসঙ্গে মরলে কোনো দুঃখ থাকে না। কালীতারা বিজলীকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে—এ-দৃশ্য দেখে হাসি-মুখে মধুও জায়গা করে নেয় এক পাশে।

হোক বিপদ। বিপদে দেখা পেয়েছে বলেই না কালীতারা জড়িয়ে ধরেছে বিজলীকে। মধু মনে মনে বলে, বিপদ কেটে গেলেও এদের এ-অবস্থা যেন ভাঙে না কিছুতেই। আনন্দে বুক টান করে বসে মধু।

দূর থেকে কাছে আসছে। বোধ হয় অনেক এরোপ্লেন। ঠিক বোঝা যায় না। একেবারে অন্য রকম শব্দ। ওরা দেখতে পেল না কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠল। মাটি কাঁপল। ঘর কাঁপল। বাজের মতো সাংঘাতিক আওয়াজ। বুক কেঁপে ওঠে সকলের।

হেই ভগবান রক্ষে কর—দাঁতে দাঁত লেগে যায় কালীতারার। ঘরের সব দরজা-জানালা বন্ধ। রাস্তায় কোনো শব্দ নেই। বোমার প্রচণ্ড আওয়াজ কানে লেগে আছে প্রত্যেকের। বোমা পড়েছে। কারা মরল—কত লোক মরল বুঝতে না পেরে এদের হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়।

শ্যামুয়েল এখন কোথায় আছে বসন্ত জানে না। কিন্তু তার

ভাবনায় হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে সে, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনো প্রভু। তাকে বাঁচিয়ে রাখো—

মধু কোথায় গেলি? কাছে আয়—কাছে আয়। মধুকে রাখো হরি—সকলকে রাখো!

ভয়ে হিম হয়ে যায় রেণুর দেহ। তার স্বামী এখন কোথায়। মরতে চায় না রেণু। স্বামীর কাছে ছুটে যেতে যায়। স্বামীর কোলে মাথা রাখতে পারলে বোমা পড়ুক যত খুশি। মরবার আগে সে একবার যেন শ্যামুয়েলের দেখা পায়।

স্বামীর প্রাণ রাখো প্রভু!

ছেলে! আমার একটি ছেলে ঠাকুর!

বিজলী বাঁচুক! ভগবান বিজলীকে বাঁচাও! সকলকে বাঁচাও!

প্রভু যুদ্ধ শেষ করো!

ভগবান যুদ্ধ থামাও!

সকলকে বাঁচাও—সকলকে বাঁচাও!

একেবারে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে জাপানী প্লেন। বুজ বুজ বুজ—যেন ভোমরার দল উড়ে ফিরছে আকাশে। কথা বন্ধ হয়ে গেছে সকলের। এই মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যেতে পারে। ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে এই বিরাট অট্টালিকা। উত্তেজনায় জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে ওদের।

কেউ দেখতে পায় না কিন্তু দৃষ্টি কঠিন হয়ে ওঠে বিজলীর। রক্তও চঞ্চল হয়ে ওঠে! সে শুধু একবার তাদের দেখতে চায়—যারা ললিতকে শেষ করেছে—যারা ভয় দেখাচ্ছে—অভাবের মধ্যে মানুষকে রাখছে দিনের পর দিন! তারা কারা যারা এই ঘরে এতগুলো লোককে অন্ধকারে কোণঠাসা করে মাথার ওপর ভ্রমর-গুঞ্জন করে ফিরছে!

বিজলী তাদের দেখবেই। কালীতারার বাঁধন ছাড়িয়ে লাফ দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। দরজার খিল খোলার শব্দ হয়—ঠক!

প্রথমে কিছু বুঝতে পারে না মধু। অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। তারপর চিৎকার করে, বিজু কোথা যাও? আরে, বেরিয়ে গেল—এই কর কী—মধুও ছুটে এসে রাস্তায় বিজলীর পাশে দাঁড়ায়।

বিজু কর কী? ডাকনামেই ডাকে মধু, বোমা পড়ে এখন, ঘরে চলো শিগগির—সে তাকে গায়ের জোরে টানে। উত্তেজনায় তার চোখ মুখ অন্য রকম দেখায়।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে বিজলী। বলাকার সারির মতো চলে যাচ্ছে অসংখ্য প্লেন। কিন্তু কোনো মানুষকে সে দেখতে পায় না। শুধু মধু দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে।

আর কেউ কোথাও নেই। ইস্পাতের মতো ঝকঝক করছে টানা পথ। কুকুর-বেড়ালও নেই একটা। বিজলীর চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে আসে। তার দেহ টলে পড়ে মাঝরাস্তার ওপর।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মধু। তারপর দুই হাতে তুলে নেয় বিজলীর সংজ্ঞাহীন দেহ। আবেশে রোমকূপ কেঁপে ওঠে মধুর। প্রাণপণ শক্তিতে সে তার ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকায়।

হঠাৎ মধুর খেয়াল হয় রাতটা ভয়াবহ। বাজের মতো আওয়াজ আর শোনা যাবে কিনা তাও জানা নেই। ওদিকে দরজাটাও খোলা। কারুর উঠে বন্ধ করবার সাহস হয় নি বোধ হয়। ডাক ছেড়ে কাঁদছে কালীতারা। তাদের দেখতে পাচ্ছে কিনা বোঝা যায় না।

বিজলীকে কোলে তুলে মধুও একবার আকাশের দিকে তাকায়। আলো উপচে পড়ছে। কোনো ভয় নেই চাঁদের। তেমনি করেই হাসছে শুক্লপক্ষের সেই পুরনো চাঁদ।

॥ আট ॥

নিস্তব্ধতার ভয়ঙ্কর একটা গতি আছে বোধহয়। সব থেমে আছে। এই থেমে থাকাই কালো কর্কশ পাখির মতো অমাবস্যার অন্ধকারে মাথার ওপর ঘুরে বেড়ায়। কোনো শব্দ নেই। কিন্তু মনের মধ্যে যন্ত্রণার ক্লান্তিকর বিকট আওয়াজ হতে থাকে।

কেউ শুনতে পায় না। চিৎকার করতে ইচ্ছে হয় না। অন্যকে বলবার কোনো ভাষাই হয়তো নেই। ধিকিধিকি আগুনের ঝাঁজে বুকটা জ্বলে যায়। জ্বলবেই। ঈশ্বর জানে আর কতদিন!

বেণুর বুক ঠেলে একটা লম্বা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। রান্নাঘরের চৌকাঠের ওপর বসে দুই হাটুর মধ্যে সে মুখটা গুঁজে দেয়। শীতের হাওয়ায় উনুন গমগম করে। কয়লা পোড়ে তাড়াতাড়ি।

পুড়ুক। এখুনি উনুন নিভিয়ে ফেলতে ইচ্ছে হয় না বেণুর। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলে এই শীতের সময় খেতে পারে নাকি মানুষ। দাম হু-হু করে বাড়লেও ক্লান্ত বেণু শুধু শুধু কয়লা পোড়ায়। আগুনের ধারে বসে শরীরটা একটু গরম করে নিতেও ইচ্ছে করে না তার।

বাড়িতে আর কেউ নেই এখন। বিজলী ফেরে নি কাজ থেকে। আজকাল মাঝে মাঝে ফিরতে রাত হয় তার। বসন্তও বসে আছে কবরখানায়। বিজলী তাকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গেই ফিরে আসবে।

আসুক না আসুক, অস্বস্তিতে বুক জ্বলে বেণুর। প্রতীক্ষার ক্লান্তি অবসন্ন করে দেহমন। সে শুধু চমকে-চমকে ওঠে সারাদিন।

ভয় পায়। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রতীক্ষার যে একদিন শেষ হবে সে-কথাটা ভাবতে আর ভরসা হয় না।

যন্ত্রের মতো রেণু কাজ করে। কথা বলে তোতা পাখির মতো। দম দেয়া কলের পুতুলের মতো রান্নাঘরে থালা-বাসনের ঠুনঠুন শব্দ করে দিন কাটায়। কেউ আসে না। কারুর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাও যেন নেই আর।

সংসারটা যদি বড় হত, অনেক মানুষ থাকত এ-ঘরে ও-ঘরে তাহলে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে নিজেকে ভুলে থাকত রেণু। কিন্তু কিছু নেই। মানুষ নেই। কাজ নেই। বোবা হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার তাকে শুধু নখের খোঁচা দেয়। আর দিনের বেলা একা ঘরে ডাক ছেড়ে কাঁদতে মন চায়।

শ্যামুয়েল টাকা পাঠায় নি অনেকদিন। চিঠিও দেয় নি। অমঙ্গলের আশঙ্কা করে ভয় পায় না রেণু, সংসারের অভাব তাকে বেশী পীড়া দেয়। যদিও বিজলী কাজ করে আর বসন্তও কিছু আনে মাসে মাসে তবুও খুব অল্পদিনের মধ্যেই সব টাকা ফুরিয়ে যায়। জিনিস আছে বাজারে। কেনবার সাধ্য নেই। ক্ষিদে আছে। খাবার উপায় নেই।

লোকগুলোর চেহারা বদলে যাচ্ছে। রেণু দেখে, চোখ বসে গেছে, পেট ঝুলে গেছে, গলার স্বরে জোর নেই তার চেনাশোনা সব মানুষের। জ্যান্ত লোকগুলো রেণুর চোখের সামনে যেন একটু একটু করে কবরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—সে নিজেও।

সকলের অবস্থা দেখে সব শখ রেণুর মিটে গেছে। আর কোনো সাধ-আহ্লাদ করতে চায় না সে। শুধু এই অভাবের শেষ করে দিতে চায়। যেমন করেই হোক।

মন দিয়ে আর প্রার্থনা করতে পারে না রেণু। ঈশ্বরে বিশ্বাস তার যেন অনেক কমে গেছে। কবরখানার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায়। ভয় পায় না। রুদ্ধ আক্রোশে মন জ্বলে। কবরখানাটা

তাদের প্রত্যেককে যেন ডাকে দিনরাত। ওই জায়গাটাকে সকলের চোখের সামনে থেকে সে একেবারে লুপ্ত করে দিতে চায়।

বিয়ের আগে অনেক রকম রান্না শিখিয়েছিল রেণুকে তার মা। রান্না করবার শখ তার ছেলেবেলার। পাঁচজনের সামনে থালা সাজিয়ে পাঁচরকম রান্না তুলে দিতে পারলে তার জ্বালা অনেকটা জুড়িয়ে যেত।

কিন্তু নামেই রান্নাঘর। শুধু ভাত আর একটা তরকারি। ফ্যান গালা চলে না ভাতের এখন। ফ্যান-সুদ্ধ ভাত খেতে হয় সকাল-বিকেল। পেট ভরে না একদিনও। আর দু-একদিন পর রাতের খাওয়ার পাট তুলে দিতে হবে। উপবাসে দিন কাটাতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে ওই কবরখানার দিকেই। ঠিক এই গতির মুখ ঘুরিয়ে দেবার উপায় রেণু ভাবতে পারে না!

বিজলী বলে, ব্যবস্থা নাকি করছে পাদ্রী সাহেব। সকলকে এক বেলা খিচুড়ি খাওয়ানো হবে গির্জের উঠোনে। খবরটা শুনে খেতে পাবার আনন্দে মেতে ওঠে না রেণু। তার কোনো কাজ থাকবে না সে-কথা ভেবেই নিশ্বাস ফেলে।

ফ্যান-সুদ্ধ ভাত ফোটাতে হবে না। শেকল তুলে দিতে হবে রান্নাঘরে। তার ওপর নির্ভর করবে না একটি মানুষও। কোনো দায় থাকবে না তার এই সংসারের। একেবারে অকর্মণ্য হয়ে কেমন করে বেঁচে থাকবে রেণু।

প্লেনের শব্দ পেয়ে সে মাথা তোলে। আলোর বিন্দু দেখতে পায় আকাশে। তারাও দেখে কয়েকটা। মধুর অনুভূতি জাগে হঠাৎ। ওই প্লেনে হয়তো শ্যামুয়েল আছে। তারই মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় লোকটা কিন্তু তাকে দেখতে পায় না।

কবে আবার তাকে দেখবে রেণু! প্রার্থনায় বিশ্বাস না থাকলেও আবার হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে সে জোরে জোরে বলে, প্রভু তাকে

ফিরিয়ে আনো। আমি আর কিছু চাই না। ভাত না। কাপড় না। চুড়ি না। দুল না। স্বামীকে চাই প্রভু। শুধু তাকে চাই —ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে বেণু। একা একা। অন্ধকারে।

মাথার ওপর শব্দ করে সেই এরোপ্লেনটা তখনও কিন্তু ঘুরে ঘুরে ওড়ে। আরও কয়েকটা তারাও বোধ হয় ফুটে ওঠে। রান্নাঘরে জ্বলে জ্বলে উনুন নিভে যায়।

রোগা কালো একটা বেড়াল রেণর গা ঘেঁষেই রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে। বোধ হয় বুঝতে পারে দেখতে পেলেও তাকে তাড়াবার উৎসাহ অবসন্ন রেণুর আর নেই। টিনের থালাটা শব্দ করে সরিয়ে বেড়ালটা তরকারিতে মুখ দিয়ে নাক কুঁচকায়।

কিছু টের পায় না বেণু।

শব্দ করে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায় তাদের দরজায়। কর্কশ গলার স্বর শোনা যায়। ভারী বুটের শব্দ। একটু উপরে ভীষণ জোরে দরজার কড়া নড়ে ওঠে।

এ-বাড়িতে আলো দেখতে পেয়েছে নাকি এ. আর. পি-র লোকেরা। বিচলিত হয়ে লণ্ঠনটা সরাতে যায় বেণু। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে গিয়ে সেটা উলটে গিয়ে নিভে যায়। ওদিকে জোরে জোরে কারা দরজায় ধাক্কা মেরে বলে, কে আছ বাড়িতে, দরজা খোলো শিগগির --

বেণু ভয়ে কাঁপে। দেশলাই খুঁজে পায় না অন্ধকারে। লণ্ঠনটা জ্বালাতে পারে না আবার। একটুও আলো নেই কোথাও। বাড়িতে একটি লোকও নেই। কে জানে কী উদ্দেশ্য নিয়ে কারা এসেছে বাইরে। যা দিনকাল, সবই ঘটতে পারে শহরে।

সাহস করে দরজা খোলে রেণু। সাবধানে দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে যুদ্ধের-পোশাক-পরা দু-চার জন মানুষকে দেখতে পায়। বড় একটা মিলিটারি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। শুকনো গলায় ভয়ে ভয়ে রেণু জিজ্ঞাসা করে, কে ?

আমি—

কানটা ঠিক নেই বোধ হয় রেণুর। চোখটাও বুঝি কানা হয়ে গেছে। সে ভুল শুনছে। ভুল দেখছে। অন্ধ বধিরের মতো রেণু দাঁড়িয়ে থাকে।

রেণু! আমি—আমি এসেছি—শ্যামুয়েলের ভিজে ঠাণ্ডা স্বয় শোনে রেণু।

হঠাৎ খুশির ঝাপটায় ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় শ্যামুয়েলের বুকের ওপর। তার প্রার্থনা শুনেছেন ঈশ্বর। স্বামী ফিরে এসেছে।

কৃষ্ণপক্ষ। অন্ধকারে রেণু শ্যামুয়েলের মুখ দেখতে পায় না। গায়ের জোরে তার হাত ধরে মনের সব উত্তাপ বুঝি উজাড় করে দিতে চায়।

ঘরের ছেলে ঘরে যা। চলি রে শ্যামুয়েল—বড় কর্কশ স্বর শ্যামুয়েলের সঙ্গী ওই যুদ্ধের মানুষগুলোর। জিনিসপত্র ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে লাফিয়ে গাড়িতে চড়ে। শব্দ করে দরজা বন্ধ করে। অকারণে দু-তিনবার তীক্ষ্ণ হর্ন বাজায়। নিজেদের মধ্যে কী বলা-বলি করে হো হো করে হাসতে হাসতে গাড়ি চালিয়ে চলে যায়।

তখন শ্যামুয়েলকে দুই বাহু দিয়ে বাঁধে রেণু। না-খেতে-পাওয়া শরীরে এত জোর ছিল তা নিজেই জানত না স্বামী ফিরে আসবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। রেণু মাথা ঘষে শ্যামুয়েলের খাঁকি-শার্ট-পরা বুকে। অনেকক্ষণ। কাঁদে। মনে মনে বার বার বলে, ঘরে এসেছে—ফিরে এসেছে। আর ছাড়বে না। আর যেতে দেবে না। দরজাটা যে খোলা আছে এখনও সেকথা মনেও থাকে না।

আর যাবে না তুমি।

এক কথায় শ্যামুয়েল রাজী হয়ে যায়, না যাব না।

কিন্তু আর কথা বলে না সে। রেণুকে আদর করে না। বুকে চেপে ধরে না আগের মতো। স্বামীর দেহ শীতের সকালে মার্বল পাথরের ঠাণ্ডা বড় কবরটার মতো মনে হয় রেণুর। ভাবে, ক্লান্ত

শ্যামুয়েল। কতদূর থেকে এসেছে! বসুক। ঘুমোক। বিশ্রাম করুক। তবে তো তেজ ফিরে আসবে মানুষটার।

বস গো তুমি। দেশলাইটা দাও আমায়। বাতি জ্বালি। মুখটা দেখি তোমার। কতদিন দেখি নি—

না না, বাতির দরকার নেই, এক পা এগিয়ে তক্তাপোশের ওপর শুয়ে পড়ে শ্যামুয়েল। হাতের মোটা লাঠিটা সাবধানে নিচে রাখে। পা ধোয় না। পোশাক ছাড়ে না। শুধু রেণুর মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, কেমন আছ রেণু?

যেন অভাব নেই। যন্ত্রণা নেই। আর কোনো দুঃখ নেই। স্বামীর গালে হাত রেখে খুশিতে হাসে রেণু, খুব ভালো। এবার ভালো করে দেখি তোমায়। বাতিটা জ্বালি—

না না, ভীত স্বরে শ্যামুয়েল বলে, এই আঁধারেই থাকি দুজন। ভালো লাগে না তোমার?

লাগে গো। খুব ভালো লাগে—কথা শেষ হয় না রেণুর।

বসন্তর গলার স্বর শোনা যায়, দরজাটা এমন করে খোলা রাখে কেউ এই বিপদ-আপদের রাতে—

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে উল্লাসে চিৎকার করে রেণু, বাবা ও এসেছে!

কে?

বিজলী জিজ্ঞেস করে, কে এসেছে রেণু?

তোমার ভাই। এই যে—অন্ধকারেই আঙুল দেখিয়ে রেণু ওদের বুঝিয়ে দিতে চায় যে তক্তাপোশের ওপর শুয়ে আছে শ্যামুয়েল।

দাদা!

শমু! কই কই? কখন এলি বাবা? লণ্ঠনটা আনো রেণু। অন্ধকারে কিছু যে দেখি না—

বসন্তর সামনে শ্যামুয়েলের কাছে দেশলাই আর চায় না রেণু।

রান্নাঘরে ছুটে এসে দেশলাই খুঁজে লণ্ঠন জ্বালায়। তারপর সলতে উঁচু করে দিয়ে আবার ছুটে আসে সে-ঘরে। হাসিমুখে আলো তুলে ধরে স্বামীকে দেখে রেণু। বসন্ত আর বিজলীকে দেখায়। শ্যামুয়েল কিন্তু চোখ খোলে না। পাশ ফিরে মুখ লুকোয়।

এ কী! লণ্ঠনটা কাঁপতে থাকে রেণুর হাতে। গালে ছেঁকা লাগে। মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, পায়ের কী হল তোমার?

বসন্ত আর বিজলী দেখে একটা পা নেই শ্যামুয়েলের। কেটে একেবারে বাদ দেয়া হয়েছে। রেণু কাঁদছে। বলছে, দোষ আমার। ঈশ্বরকে বলেছিলাম শুধু ফিরিয়ে আনতে। হাতের কথা বলি নি। পায়ের কথা বলি নি। এ কী করলে প্রভু। মানুষটাকে খোঁড়া করে দিলে।

বিজলীর বেশি দুঃখ নেই। কী দরকার পায়ের। প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে তাই ঢের। অনেকে যায় বটে যুদ্ধে কিন্তু ফিরে তো আর আসে না। বিজলী রেণুর হাত থেকে নিয়ে লণ্ঠনটা টেবিলের ওপর রাখে। তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সেই কথাটাই তাকে বোঝাতে থাকে। কিন্তু কান্না থামে না রেণুর।

বসন্তর মুখে কথা নেই। নড়ে না। স্থির হয়ে বসে থাকে। একবার বলে, প্রভু যা করেন মঙ্গলের জন্যেই। উঠে দাঁড়ায়। শ্যামুয়েলের প্রত্যাবর্তনের কথা কবরখানায় গিয়ে সরলাকে জানিয়ে আসতে চায়। বিজলী বারণ করে। শীতের রাতে বাপকে আর বাইরে বার হতে দিতে চায় না। কিন্তু কারুর কথা শুনবে নাকি বসন্ত। সরলাকে বলতেই হবে। দু-জনে মিলে এক সঙ্গে কাঁদবে ছেলের জন্যে। সব বাধা এড়িয়ে রাস্তায় নামে বসন্ত।

জোরে কেঁদে ওঠে শ্যামুয়েল, ও বিজু কী হবে? কোনো কাজ হবে না। খোঁড়া হয়ে বাঁচব না—

ছিঃ দাদা, ছোট ছেলে নাকি তুমি? যাদের পা নেই তারা

বুঝি শুধু শুয়ে শুয়ে কাঁদে? কাপড় ছাড়ো। কিছু মুখে তো দাও আগে। রেণু কী আছে রান্নাঘরে দেখো না—

শ্যামুয়েল বলে, আমার ওই ব্যাগের মধ্যে দেখো কয়েকটা মাছের টিন আছে—

রেণুর কিন্তু উৎসাহ থাকে না শ্যামুয়েলের ব্যাগ খুলে টিনের মাছ বের করবার।

সকালবেলা খবর পেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে রেণুর মা আর বাবা আসে। জামাইএর দুঃখে ফোঁপায়। মেয়ের দুর্ভাগ্যে কাঁদে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে দেখতে পারে না শ্যামুয়েলকে।

তাদের দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না শ্যামুয়েল। ফিরে এসে ভুল করেছে সে। বেঁচে আর সুখ হবে না তার। রেণু তাকে ভালোবাসতে পারবে না। যারা দেখবে তারা কৃপা করবে। লাঠি ঠকঠক করে একটা পা নিয়ে কেমন করে সে মুখ বার করবে পাঁচজনের সামনে। তার চেয়ে মরে গেলে হত। ট্রাক থেকে লাফিয়ে পড়ে কিংবা বন্দুকের গুলি নিজের বুকে চালিয়ে। যেখানে শ্যামুয়েল ছিল মরা তো কতই সোজা সেখানে। তিক্ত দুর্বিষহ জীবন। এমন করে বেঁচে থাকতে চায় না সে।

কই শ্যামুয়েল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে মধু ডাকে, কত লোক দেখতে এসেছে তোকে। একবার বাইরে আয়, আমরাও দেখি ভালো করে—

শরীরটা তাড়াতাড়ি তক্তাপোশের ওপর আরও গুটিয়ে নেয় শ্যামুয়েল। অস্বস্তি বোধ করে। কী দেখবে ওরা? খোঁড়া একটা মানুষ। চাকরি গেছে। আহা বলবে। চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকবে তার পায়ের দিকে। সান্ত্বনা দেবে। কেউ কেউ হয়তো জানতে চাইবে দুর্ঘটনা ঘটল কেমন করে। মধুর ওপর রাগ হয় শ্যামুয়েলের। কী দরকার ছিল দলবল নিয়ে তাকে কৃপা দেখাতে আসবার। সে দেখবার জিনিস নাকি!

এই শমু, ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে মধু, আয় ভাই একবার বাইরে আয়, সে ফিরেও দেখে না শ্যামুয়েলের খোঁড়া পায়ের দিকে, আমরা ফুলের মালা এনেছি তোর জন্যে। আয় সকলে মিলে গলায় পরিয়ে দিই তোর—

কিছু বুঝতে পারে না শ্যামুয়েল। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মধুর মুখের দিকে। তক্তাপোশের ওপর উঠে বসে। কৌতূহলী হয়ে রেণুও উঁকি মারে। এ-ঘরে আসে না। কিন্তু কান খাড়া করে থাকে। তার স্বামীকে মালা পরাতে কেন এত লোক ভিড় করেছে তাদের দরজায়। ভাবে হয়তো রাজার জন্যে যুদ্ধ করেছে বলেই খাতির করতে এসেছে।

শ্যামুয়েল বলে, মালা! মালা কী হবে?

তুই আমাদের কত উপকার করেছিস! বুকে বল দিয়েছিস! শ্যামুয়েলের হাত ধরে দরদ দিয়ে বলে মধু, মনে নেই আগেরবার এসে দাস সাহেবের আপিসে গিয়েছিলি?

হ্যাঁ, কিছু বোঝে না শ্যামুয়েল, তা গিয়েছিলাম তো কী হয়েছে? কী বলিস মধু, তোর কথা বুঝি না।

ওরে বুঝবি--বুঝবি। তুই বলেছিলি বলেই না আমরা মাইনে বাড়িয়ে দেবার কথা সাহেবকে বলেছিলাম। তুই যুদ্ধে যাবার ভরসা দিয়েছিলি বলেই না আমাদের সাহস বেড়েছিল। আমরা অ্যালবার্টের চাকরি রেখেছি। আমরা মাইনে বাড়াবার আরজি পেশ করেছি। আর নাকচ করতে পারবে না দেখিস---

এক হাতে মোটা লাঠি আর-এক হাত মধুর কাঁধে—শ্যামুয়েল বাইরে আসে। এই প্রথম হাসতে দেখা যায় তাকে। বাইরে অনেক লোক। সকলকে চিনতে পারে না শ্যামুয়েল।

মধু চিৎকার করে ওঠে, এই যে, এই যে!

আয় ভাই। বেঁচে থাক। শ্যামুয়েলের জয়!

আমজাদ মালা হাতে এগিয়ে আসে। আব্দুল নটবর জটাধর

আর ওরা সকলে ঘিরে দাঁড়ায় শ্যামুয়েলকে। হাসতে হাসতে তার গলায় মালা পরিয়ে দেয় আমজাদ। সমস্বরে পাড়া মাতিয়ে ওরা বলে ওঠে, শ্যামুয়েলের জয়!

চলতে চলতে রাস্তার লোক চমকে ওঠে। ঘুরে ঘুরে তাকায়। এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে মেয়েরা দেখে। মালা গলায় শ্যামুয়েল হাসিমুখে পিছন ফিরে দেখে রেণু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে তাকে। লাঠিটা হাত থেকে পড়ে ঠক শব্দ করে গড়িয়ে দূরে চলে যায়। কিন্তু অসুবিধা হয় না শ্যামুয়েলের, মধুর কাঁধে আরও জোরে ভর দিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তাড়াতাড়ি লাঠিটা তুলে দেয় একজন। শ্যামুয়েল নেয় না। হাসে। ইচ্ছে করেই লাঠি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবার।

আমজাদ বলে, আপনি বহুদিন লড়েছেন। বেশি বোঝেন, বেশি জানেন। বিপদে-আপদে আমরা আসব আপনার কাছে পরামর্শ নিতে—

শ্যামুয়েল বলে, আসবেন। কাজ তো নেই আমার এখন।

নটবর আমজাদের পাশে দাঁড়িয়ে বলে, আপনার সাহসের কথা সব শুনেছি আমরা। আপনি গুরু আমাদের—

হেঁ হেঁ, কী যে বলেন।

ঠিক বলে শম্ভু, অ্যালবার্ট চিৎকার করে ওঠে, তুই না উস্কালে চাকরি খতম হয়ে যেত আমার—

জোসেফ বলে, জুতোর তলায় থাকতাম আমরা।

ওদের বিদায় করে গলায় গন্ধফুলের মালা দোলাতে দোলাতে শ্যামুয়েল ঘরে ফিরে আসে। পায়ের কথা মনে থাকে না। পা যেন কাটা যায় নি। মনের জোরে খোঁড়া পা-টা যেন এক মুহূর্তে নিজে নিজেই শ্যামুয়েল জোড়া লাগিয়ে দেয়।

রেণু, আগের মতো হেসে সে বলে, মালা নাও।

কী হল গো? এত খাতির কেন গো? বলো বলো—

ওদের সাহস দিয়েছি না? ভরসা দিয়েছি না? মাইনে বাড়বে ওদের। ভালো থাকবে। ভালো খাবে। হেঁ হেঁ, আমারই জন্যে না?

তাই নাকি গো? তুমি গুরু ওদের? সর্দার? অত লোক মানবে তোমায়?

কী ভাবে শ্যামুয়েল। কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে। তারপর বলে, পরামর্শ দিতে হবে ওদের। খেটে খেটে সারা হয়ে যায় বেচারারা। আর মোটে বত্রিশ টাকা মাইনে পায়। ফুঃ—

আজ প্রথম রেণুকে আবার বুকে টানে শ্যামুয়েল। দেহে বল ফিরে এসেছে তার। মনে তেজ এসেছে। যেন এক পায়েই এবার যুদ্ধ করে বিশ্ব জয় করবার ক্ষমতা হয়েছে। রেণুও সে-কথা বুঝতে পারে। তাই স্বামীর সোহাগে গলে যায়। কৃতার্থ হয়ে যায়।

॥ নয় ॥

মৃত্যুর একটা রূপই এতদিন দেখেছিল বিজলী। শান্ত করুণ আর বিচ্ছেদের বেদনায় সার্থক রূপ। কবরখানার ফুল পাখি গাছ রোদ ছায়া আলো আর অন্ধকার দেখে মৃত্যুকে সুন্দর মনে হত বিজলীর। সব জ্বালা জুড়িয়ে দেবার দয়ালু দূতের মতো।

মৃত্যুর এই রূপ দেখেছিল বলেই কবরখানা তাকে যন্ত্রণা দেয় নি। শান্তি দিয়েছে। শ্রদ্ধা জাগিয়েছে। তাই বোধ হয় মরতে ভয় ছিল না বিজলীর। একটা রঙ দেখেছিল বলেই মৃত্যুর বিরুদ্ধে কোনোদিনও কোনো প্রতিবাদ তার মনে জাগে নি।

হঠাৎ আর-একটা রূপ দেখল বিজলী। মৃত্যুর ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর বীভৎস রূপ। কবরখানার মাটি ফেটে যেন চৌচির হয়ে গেছে প্রবল ভূমিকম্পে। গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে যত শ্বেত পাথর। একটাও পাখি নেই কোথাও। গাছ ভেঙে পড়েছে। ফুল শুকিয়ে গেছে। উষ্ণ রুক্ষ ধূলির ঝাপটা এসে লাগছে চোখে-মুখে।

কবরখানার মাটির তলা থেকে ছিটকে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে হাজার হাজার মানুষ। ক্ষয়ে যাওয়া দেহ। অন্ধকারে থেকে থেকে চলতে ভুলে গেছে। বসে পড়ে। হাঁপায়। জিব বেরিয়ে যায়। শুয়ে পড়ে। রস গড়ায় মুখ থেকে। ওঠে না। পড়েই থাকে দিনের পর দিন। পিঁপড়ের সারি চলে দেহের ওপর দিয়ে। প্রাণ আছে। পিঁপড়ে কুরে কুরে দেয় শরীর। বাধা দেবার শক্তি নেই।

কোথা থেকে ওরা দলে দলে আসে। কোলে ছোট ছেলে। গায়ে ছেঁড়া ন্যাকড়া। চোখের কোনায় কালি। মুখে করুণ দৃষ্টি। গলা দিয়ে স্বর বার হয় না। কেঁদে কেঁদে তীক্ষ্ণ দীর্ণ সুরে আর্তনাদ করে, ভাত দাও মা—ভাত দাও!

বিজলী চমকে ওঠে। ভোর থেকে সারা পাড়াময় ওরা ডেকে ডেকে ফেরে। সে ঘরে বসে থাকতে পারে না। ডাক শুনে বাইরে আসে। চোখ ঠেলে জল পড়ে।

ভাত দাও মা—তুটি খেতে দাও—

শীর্ণ একটি মেয়ে। পেট মিশে গেছে পিঠের সঙ্গে। কচি বাচ্চাটা বুকে সেঁটে আছে এক ফোঁটা তুধের আশায়। কাঁদছে না। ঝিমিয়ে পড়েছে। গলা কাঠ হয়ে গেছে তৃষ্ণায়।

ভাত দাও মা—ভাত দাও—বুক-কাঁপানো করুণ একটানা সুর।

বিজলী তাড়াতাড়ি একমুঠো চাল এনে বলে, এই নাও।

কিন্তু চাল নিতে চায় না মেয়েটি। দাঁড়িয়ে থাকতেও পারে না। ক্ষুধার যন্ত্রণায় বসে পড়ে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে। টেনে টেনে রুক্ষ চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে বলে, চাল না। চাল কী হবে? ভাত দাও মা—ফ্যান দাও—মা গো মা!

বিজলী রান্নাঘরে ছুটে আসে। রেণুকে ডাকে। উনুন ধরিয়ে তুটো ভাত ফুটিয়ে নিতে চায়। হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে। দেহ হিম হয়ে যায় বিজলীর। ভাত ফোটাতে এত সময় লাগে কেন।

উনুন ধরায় না এরা আর সকালে। চা খায় না। রুটি খায় না। তুপুরে যায় গির্জের উঠোনে। খিচুড়ি খায়। ওই একবারই। চাল জুটলে রাতে উনুন ধরিয়ে ফুটিয়ে নেয়। না হলে উপবাস।

সাধ্যমতো ব্যবস্থা করেছে পাদ্রী সাহেব। গরিবের দল পাত পেড়ে বসে যায় রোজ গির্জের উঠোনে। লোক বাড়ে দিনে দিনে। বিজলী নিজেই খেতে পায় নি কতদিন। ক্ষুধার যন্ত্রণায়

অস্থির হয়ে পড়ে নি। পরকে নিজের ভাগ খাওয়াতে পেরেছে বলে আনন্দ পেয়েছে।

সঙ্গে করে বেশ কিছু টাকা এনেছিল শ্যামুয়েল। ওই একবারই। ওই শেষ বার। আর টাকা পাবে না সে। দেখতে দেখতে টাকা ফুরিয়ে গেল সব। যায় যাক। কে টাকা চায়। কিন্তু মানুষগুলোও যে ফুরিয়ে যাচ্ছে—তার কী হবে।

ভাত রাঁধ কেন বিজু? রেণু জিজ্ঞেস করে, খেতে যাবে না বুঝি? মোটে তো দু মুঠো চাল আছে ঘরে—

বিজলী বলে, মেয়েটা মরল বুঝি বাইরে। ওকে খাওয়াই—ওকে বাঁচাই—টিনের থালায় ফ্যানসুদ্ধ ভাত ঢেলে দুটো কাঁচা লঙ্কা ফেলে বিজলী।

আহা বেচারী! ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেটাকে ছাড়ে নি। শক্ত করে ধরে রেখেছে বুকের ওপর। একটা কুকুর মুখ চাটছে। চিল উড়ছে মাথার ওপর। কাছ থেকে—দূর থেকে—চারপাশ থেকে সেই একটানা ক্লান্ত দীর্ণ স্বরই ভেসে আসছে, ভাত দাও মা—ফ্যান দাও!

কুকুরটাকে তাড়ায় বিজলী। ভাতের থালা নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে। আস্তে আস্তে মেয়েটিকে জাগাতে চায়, ওঠো। এই। তোমার জন্যে গরম ভাত এনেছি। খাও—

নড়ে না মেয়ে। ঘুম ভাঙে না। সিঁদুর আছে সিঁথিতে। সধবা। ওর গায়ে হাত দেয় বিজলী। চমকে ওঠে। পিছিয়ে যায়। ভাতের থালা পড়ে যায় হাত থেকে। কুকুরটা ছুটে এসে মুখ দেয়।

কোলের ছেলেটা নড়ে ওঠে। পিটপিট করে চোখ মেলে বিজলীকে চেনবার চেষ্টা করে। বুঝতে পারে না মরা মায়ের বুকের ওপর সেঁটে আছে। আর কোনোদিনও এক ফোঁটা দুধও গলায় ঢেলে দিতে পারবে না তার মা।

ডাক ছেড়ে কাঁদে বিজলী। ঠিক সময় খাবার মুখে তুলে দিয়ে বাঁচাতে পারল না একটি মাকে। কী করবে এখন ছেলেটা। চিলে ছোঁ মারবে—কুকুরে নিয়ে যাবে। ওকে জোর করে মায়ের বুক থেকে ছাড়িয়ে নেয় বিজলী। বুকে চেপে ধরে।

এত আদর সহ্য করতে পারে না ওই কচিছেলে। সরু সরু হাত-পা। ছোট ছোট চোখ। রক্ত নেই গায়ে। হলদে শরীর। মায়ের বুক ছেড়ে উঠতে চায় নি কিছুতেই। বিজলীর কোলে এসে ঘাড়টা যেন ভেঙে যায়। ঢলে পড়ে। আর ওঠে না।

ভয় পেয়ে ছেলেটাকে আবার মায়ের বুকে রেখে দেয় বিজলী। ও আব থাকে না সেখানে। গড়িয়ে পড়ে যায়। ক্ষোভে দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বিজলী কাঁপে। আর্তস্বরে শ্যামুয়েলকে ডাকে। রেণুর নাম ধরে চেঁচায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

রেণু আর শ্যামুয়েল এসে বিজলীকে তুলে ধরে। জোর করে ঘরে নিয়ে যায়। মা আর ছেলে বাইরে পড়ে থাকে। অনেকক্ষণ। বিকেলে মিলিটারি গাড়ি এসে দুজনকেই তুলে নিয়ে যায়।

একজন বড় আর একজন খুব ছোট।

মা আর ছেলে।

কবরখানা হয়ে গেল সারা শহর।

কফিন আনে না কেউ। চান করায় না। সাজায় না। ফুল হাতে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে না চোখ বুজে। মাটি চাপাও দেয় না। ধুঁকতে ধুঁকতে মরে লোক। মৃতদেহ পড়ে থাকে রাস্তায় দিনের পর দিন।

দুপুরবেলা বিজলী বসন্ত রেণু আর শ্যামুয়েল একসঙ্গেই খিচুড়ি খেতে যায় গির্জের উঠোনে। চলতে পারে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান্না শোনে মানুষের। চোখ বুজে কানে আঙুল দিয়ে বসন্ত তাড়াতাড়ি পথটা পার হয়ে যায়।

দৃষ্টি বিষণ্ণ হয়ে ওঠে শ্যামুয়েলের। হাতের মুঠোয় শক্ত করে লাঠি ধরে সে দেখে—যারা তার চোখের সামনে ক্ষুধার যন্ত্রণায় তিল তিল করে ভুগে মরছে তাদের। দেখতে দেখতে নিজের পেটের কথা ভুলে যায়। নিজের সংসারের কথাও মনে থাকে না।

যন্ত্রণায় ভুগে মানুষকে মরতে দেখা নতুন নয় শ্যামুয়েলের চোখে। তবু সে চমকে যায়। ভয় পায়। যুদ্ধের চেয়ে দুর্ভিক্ষ আরও সাংঘাতিক মনে হয়। গোলা-বারুদ আর বোমার গর্জনের চেয়ে নিরস্ত্র মানুষের হাহাকার আরও ভয়ঙ্কর হয়ে বাজে তার কানে! মৃত্যুর এমন উগ্র করাল রূপ যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও দেখতে পায় নি শ্যামুয়েল।

ক্ষিধে মরে যায় রেণুর। খেতে ইচ্ছে করে না। যেতে মন চায় না গির্জের উঠোনে। রাস্তায় মানুষকে মরতে দেখে আর ভাবে কত সামান্য তার দুঃখ। ঘর আছে রেণুর। স্বামী আছে। শ্বশুর আছে। ননদ আছে। বাপ-মা আছে। গির্জের উঠোনে খিচুড়িও আছে। পেট ভরিয়ে আবার ঘরে ফিরে যাবে। মরবে না।

তাই মানুষকে মরতে দেখে বাঁচাবার সাধ জাগে রেণুর। ঘরে তুলে নিয়ে যেতে চায়। ক্ষুধার তাড়নায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে ওরা। ফিরবে বলেই বেরিয়েছে। বাঁচবে বলেই শহরে এসেছে। বউ ছেলেমেয়ের হাত ধরে কত ক্রোশ পথ হেঁটে।

মরতে চায় না। চিৎকার করে ভিক্ষে চায়। শেষ চেষ্টা করে বাঁচবার। জ্বলে ওঠে। দ্বার থেকে দ্বারে টলে টলে যায়। তারপর একেবারে নিভে যায়। হাত থেকে পড়ে যাওয়া ম্লান-শিখা ঝুল-ধরা লণ্ঠনটার মতো।

বউ যায়। ছেলে যায়। মেয়ে যায়। নিজেও যায়। যেতেই হয়। ঘর তো আগেই গেছে। রেণু ভাবে আর পথ চলে। চলতে চলতে বসে পড়তে ইচ্ছে করে ওদেরই পাশে।

হাঁটতে হাঁটতে বিজলী ডাকে, দাদা।

কী রে বিজু ?

দেখতে পারি না—শুনতে পারি না।

তবু দেখতে হয়। তবু শুনতে হয়। বোনকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই শ্যামুয়েলের। বউএর দুঃখ দূর করবার সাধ্য নেই। বাপকে তাজা রাখবার উপায় নেই।

লোকটা হাত নেড়ে ওদেরই ডাকে বোধ হয়। নামমাত্র কাপড় গায়ে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কথা বলতে কষ্ট হয়। পার্কের রেলিঙে পিঠ দিয়ে বসে আছে কোনো রকমে। ওর দিকে চোখ পড়তেই ডাকে।

কী বলছ ? নিচু হয়ে জিজ্ঞেস করে বিজলী।

থেমে থেমে কথা বলে লোকটা। চোখ বড় হয়ে যায়। জোয়ান বয়স। বুড়িয়ে গেছে না খেয়ে খেয়ে। রোদে বসে আছে কিন্তু ঘাম নেই শরীরে।

একবার দেখবে মা, কোথায় গেল ?

কার কথা বলছ ? কে কোথায় গেল ? বিজলী ভাবে বোধ হয় মাথার ঠিক নেই। প্রলাপ বকতে শুরু করেছে।

বউটার কথা বলছি। উঠতে পারি না। শক্তি নেই। চেয়ে-চিন্তে ফ্যান আনল বউ। নিজে খেল না একটুও। জোর করে সবটাই খাওয়াল আমাকে।

মরুক এখন। জল আনতে গেছে। আর আসে না। একবার দেখবে মা কোথায় গেল ?

শুকনো চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। বসে থাকতে পারে না মানুষটা। শুয়ে পড়ে গোড়ায়। বউএর নাম ধরে ডাকে। বিজলীর পা ধরে হাউমাউ করে কাঁদে। মরতে চায় না।

পিছিয়ে যায় বিজলী, কোন দিকে গেছে তোমার বউ ?

দূরে যেতে পারে নাকি ? এক ফোঁটা ফ্যান পড়ে নি মুখে।

দেরি দেখে ভয় লাগে। মরে পড়ে আছে বুঝি—বাপ ভাই আর রেণুকে এগিয়ে যেতে বলে বিজলী। নিজে সেই বউকে খোঁজে এপাশে-ওপাশে। জলের কলের ধারে। কত ছেলেমেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রাস্তায়। আর উঠবে না। কত মেয়ে আসছে বসছে ঝিমিয়ে পড়ছে। ওই লোকটার বউকে চিনবে কেমন করে বিজলী।

আবার ফিরে এসে বলে, কেমন দেখতে তোমার বউ? কোন-দিকে গেছে বল না?

সাড়া দেয় না কেউ। ভয় পায় না বিজলী। কাঁদে না। শুধু দাঁতে দাঁত লেগে যায় তার। শিরা ফুলে ওঠে। মাথা দপদপ করে। শক্ত করে রেলিঙ ধরে দাঁড়ায়। নিঃসাড় দেহটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। একটু আগে বউএর খবর জানবার জন্যে ছটফট করছিল যে লোক—বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় সে আর নেই

একটা বউ কিন্তু এদিকেই এগিয়ে আসে। চলতে পারছে না। যেন সাবধানে থেমে থেমে পা ফেলছে। দেহটার কাছে এসে বসে পড়ে। একটু জিরিয়ে নিয়ে হাসে। হাতের সরাটা মাটিতে রাখে। ধুয়েই এনেছে। জল শুকিয়ে যায় নি এখনও। আঁচলে বাঁধা ছিল অনেকটা খিচুড়ি। আঁচল নিঙড়ে সরাটায় ঢালে।

যেন বিশ্ব জয় করে স্বামীর জন্যে মণি-মুক্তো এনেছে বউ, দুজনের তরে এনেছি—এত্ত। জোরে ঠেলা দেয় স্বামীকে, ওগো—

নড়াতে পারে না। দুই হাতে শক্ত করে দেহটাকে আঁকড়ে ধরে। কপাল ঠোকে বাহুর ওপর। সরা উল্টে খিচুড়ি ছড়িয়ে দেয় রাস্তায়। গায়ের জোরে সরার বাড়ি মারে নিজেরই মাথায়। শব্দ হয়। টুকরো হয়ে সরাটা ছিটকে পড়ে।

আর সেখানে এক মুহূর্তও বসে থাকে না বউ। উন্মাদিনীর মতো ছুটে চলে যায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বিজলী ভয় পায়। ওই বউএর মতোই ছুটে চলে যায় সেখান থেকে। খেতে যায় না সেদিন। কতদিন খাওয়ায় রুচি থাকবে না বোঝে না। ঘরে এসে শুয়ে পড়ে তক্তাপোশে।

দেহ ভেঙে আসে।

একটাই গেট গির্জের। ওটাতে তালা লাগিয়ে দেয়া হল দুপুর বেলা। চাবি থাকে বিজলীর কাছে। গন্ধে গন্ধে বাইরে ভিড় জমে মানুষের। তীক্ষ্ণ করুণ চিৎকার আসে, ফ্যান দাও—ফ্যান দাও—এখন খাওয়াবার ভার পড়েছে বিজলীর ওপর। খুব সকালে এখানে আসতে হয় তাকে। বিজলী একা আসে না। রেণুকেও নিয়ে আসে সঙ্গে। ইট দিয়ে বড় বড় উনুন তৈরি করে। কাঠ চাপায়। কড়ায় চাল ডাল চাপিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে চুপচাপ। একটাও কথা বলতে ইচ্ছে করে না তার।

পরিবেশন করবার সময় আরও কয়েকজন আসে তাদের সাহায্য করতে। ফাদার হোমস আর ব্যানার্জিও হাত গুটিয়ে এগিয়ে আসেন। কয়েকটা বড় বড় খিচুড়ির ড্রাম থাকে এক কোনায়। ধোঁয়া ওঠে। বালতি ডুবিয়ে গরম খিচুড়ি তুলে নিয়ে পরিবেশন করা হয়।

প্রথম প্রথম বাপ ভাই বৌদি আর অনেক জানাশোনা লোকের সঙ্গে পেটভরে খেতে আনন্দ হত বিজলীর। ভয় কী তাদের। আসুক দুঃখ। উঠুক হাহাকার। অসীম ক্ষমতা পাদ্রী সাহেবের। তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখলে ভাবনা থাকে না। দুঃখ থাকে না।

পাদ্রী সাহেবকে হা-হুতাশ করতে কোনোদিনও তো শোনে নি

বিজলী। ক্ষমা-সুন্দর স্মিত মুখ ফাদারের। বিজলী দেখেছে আর নির্ভর করেছে পরিপূর্ণ ভাবে। ভালোবেসেছে আর ভক্তি করেছে।

বড় লোকের ছেলে ফাদার হোমস। কোন এক লাট সাহেবের আপন নাতি। মানুষের দুঃখে মন কেঁদেছিল বলেই না ধনসম্পদ ছেড়ে প্রভুর পায়ে সঁপে দিয়েছেন।

কতটুকু আহার করেন তিনি! কতটুকু রাখেন নিজের জন্যে! সাইকেল চালিয়ে লোকের বাড়ি-বাড়ি ঘোরেন। মন দিয়ে দুঃখ-অভাবের কথা শোনেন। ধর্মের কথা বলেন। সান্ত্বনা দেন। বোঝান মনটা পবিত্র রাখলেই দুঃখের দাগ লাগে না। আর পবিত্র মনেই ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হয়। তখন সব দুঃখ আর অভাব দূর হয়ে যায় মানুষের।

ফাদার হোমসএর পাশেই আছেন ফাদার ব্যানার্জি। টকটকে গায়ের রঙ। দীর্ঘ দেহ। সাহেবের মতোই। মুখে স্নিগ্ধ হাসি লেগে থাকে সব সময়। কথা বলেন আস্তে আস্তে। গলার স্বর তোলেন না কখনও। তাঁর কথা শুনতে শুনতে ভক্তিভাব প্রবল হয় লোকের মনে।

সহজ সরল ভাষায় তিনি বুঝিয়ে দেন প্রভুর বাণী, অন্যায়কারীকে শাস্তি দেবার ভার তোমার নয়। আমারও নয়। প্রতিশোধের ক্ষীণতম বাসনা যেন আমাদের মনে কখনও না উদয় হয়। আমাদের ধর্ম প্রেম—মানুষকে ভালোবাসা!

কিন্তু অন্যায়কারীর দল শাস্তি পাবেই। সে-ভার গ্রহণ করেছেন স্বয়ং ঈশ্বর। যারা অন্যায় করে—নিপীড়িত করে মানবাত্মাকে—অবিচার অত্যাচার আর লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় মানুষের শান্তি অন্যায়ভাবে হরণ করে নেয়—বঞ্চিত করে মানুষকে সুখভোগ থেকে—তাদের নিস্তার নেই।

সময় আসবেই। শেষ হবে অন্যায়-অত্যাচারের দিন। এমন

এক স্থান আছে যেখানে যন্ত্রণায় জর্জরিত হবে পৃথিবীর যত অন্যায়কারীর দল।

যারা কাঁদিয়েছে মানুষকে তাদেরও কাঁদতে হবে। অন্যায় আনে ক্রন্দন আর ভালোবাসা আনে সুখ… ·

কথা বলবার ধরনটা একেবারেই অন্যরকম ফাদার ব্যানার্জির। শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যায় বিজলী। শাস্তির কথা ভেবে ভয় পায়। কোনোদিন সে যেন অন্যায় কাজ না করে--কোনো মানুষকে দুঃখ না দেয়।

সাদা চোখে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। কিন্তু বিজলীর মনে হয় এঁরা দুজন যেন ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তি। তিনিই পাঠিয়েছেন এঁদের পৃথিবীতে মানুষের পাপ ক্ষমা করবার জন্যে। মানুষের সব দুঃখ দূর করে তাদের সুখী করবার জন্যে। ওঁরা আছেন বলেই তো খাওয়া জুটছে বিজলীর। ওঁরা ব্যবস্থা করেছেন বলেই তো ক্ষুধা মিটছে এতগুলি লোকের। ভক্তিভরে বিজলী তাকিয়ে থাকে এই দুজন মহাপুরুষের দিকে।

হাতের গ্রাস মুখে তুলতে পারে না বিজলী। হাত কেঁপে ভাত পড়ে যায় পাতার ওপর। এখান থেকে দেখা যায় না বটে কিন্তু কান্না শোনা যায়। অসংখ্য মানুষের ক্ষুধার আর্তনাদ। ওরা বোধ হয় বুঝেছে খাবার আয়োজন হয়েছে ভেতরে। গন্ধ পেয়েছে আহারের। তাই ডাকছে—বুক ফাটাচ্ছে চিৎকার করে, ফ্যান দাও—ফ্যান দাও! ওগো মা—প্রাণ বাঁচাও—

ফাদার হোমস্ আর ফাদার ব্যানার্জি একটু দূরে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে চমকে উঠছেন। তাকিয়ে থাকছেন গেটের দিকে। দেখতে দেখতে আর আর্তনাদ শুনতে শুনতে বিষণ্ণ হয়ে উঠছে তাঁদের মুখ।

খাওয়া শেষ হয় না বিজলীর। উঠে এসে কলের জলে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে সে এসে দাঁড়ায় ফাদার হোমসের মুখোমুখি, ফাদার!

ফাদার হোমস্ শান্ত হাসি হাসেন, কী বলিতেছ বিজলী? তৃপ্ত হইয়াছ? তোমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়াছে?

ফ্যান দাও মা—ফ্যান দাও—ওমা—ওগো মা—

বিজলীর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে, ওদের বাঁচান ফাদার। ওদের খেতে দিন—

বিজলীর পিঠে আস্তে একটা হাত রেখে ফাদার হোমস্ চোখ বুজে বলেন, তুমি খুব ধার্মিক কন্যা আছ। তোমার মঙ্গল হইবে।

আমি খেতে পারি না ফাদার, বিজলীর ঠোঁট কাপে, ও ডাক আমি শুনতে পারি না। ওদের দয়া করুন—

ফাদারের দৃষ্টি সজল হয়ে ওঠে, উহাদের দুঃখ লাঘব করিতে পারিলে আমার জীবন ধন্য হইত। আমি সদা প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব—

মা গো মা—ও মা—ও বাবা—খেতে দাও মা—ফ্যান দাও—

গেটের শিকল শব্দ করছে ঝনঝন। হাজার হাজার লোক ঠেলছে গেট। ওদের দেখতে পাচ্ছে বিজলী। শীর্ণ শুষ্ক দেহ। বুভুক্ষার রূঢ় উলঙ্গ বিকট প্রকাশ।

ছলছল চোখে সে মিনতি জানায়, গেট খুলে দেব ফাদার? অনুমতি দিন?

এখনও হাসেন ফাদার হোমস্, কী হইবে? আমাদের আয়োজন অতি সামান্য—পুঁজি অত্যন্ত অল্প। অতগুলি মানুষের আহারের সঙ্কুলান হইবে না।

হবে ফাদার হবে, তাঁর পায়ে পড়তে চায় বিজলী, আপনি ইচ্ছে করলে কী না হয়। আপনি সব পারেন—যা আছে তাই ভাগ করে খাব সকলে—

বিচলিত হইও না বিজলী। আমি কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখিয়া পরে ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিব। অন্য কিছু করিবার উপায় নাই।

ফাদার হোমসের অলৌকিক ক্ষমতার ওপর হঠাৎ সন্দেহ জাগে বিজলীর। সাধারণ মানুষের মতোই অসহায় মনে হয় তাঁকে। শান্ত স্তিমিত অবিচলিত কণ্ঠস্বর শুনে এতটুকু ভরসা পায় না। পিছন ফিরে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় গেটের দিকে। ফিরে গিয়ে আর নিজের ভাগের বাকি খিচুড়ি শেষ করবার ইচ্ছে থাকে না।

বিজলীকে দেখে বোধ হয় হিংস্র হয়ে ওঠে বুভুক্ষার পীড়ন। ক্লান্ত জর্জরিত মনে আশা জাগে। শক্তি নেই তবুও তাম্র পীতাভ হাত বাড়িয়ে শিকল ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করতে চায়।

বুজে আসে, শুকিয়ে আসে, বুকের রক্ত উঠে আসে কিন্তু যেন মাটি কাঁপতে থাকে সেই স্বরেই, ফ্যা -ন দা ও মা ফ্যা-ন দা--ও--

আগুনের একটা পিণ্ড পাকিয়ে পাকিয়ে বিজলীর বুক ঠেলে ওপরে উঠতে চায়। জ্বালা ধরিয়ে দেয়। দগ্ধে দগ্ধে মারে। তপ্ত লৌহশলাকার মতো হাতের তালুতে চাবিটা যন্ত্রণা দেয়। দরদর জল গড়িয়ে পড়ে চোখ থেকে। আগুন নেভে না।

মা—গো --মা শিকল কাঁপে। লোহা কাঁপে। মাটি কাঁপে। নিরুপায় হয়ে বুকের মধ্যে আগুনের দাহ বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না বিজলী। মূক বধির অন্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মিথ্যে হয়ে যায় ফাদার। ঝাপসা হয়ে যায় গির্জের ভেতরের আর বাইরের কারুকাজ। শুধু তার অগণিত প্রতিবেশী সত্য হয়ে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বুভুক্ষার নিপীড়ন থেকে মুক্তির প্রাণপণ আবেদন জানায়।

চোখ বুজে মনে মনে বলে বিজলী, হে ঈশ্বর ক্ষমা করো। দোষ নিও না—পাপ নিও না। তুমিই তো বলেছ, প্রতিবাসীকে ভালোবাসিও—অলৌকিক ক্ষমতায় মুখ জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে বিজলীর। নিমেষে চাবি ঘুরিয়ে সে গেট খুলে দেয়।

গতির প্রবল তোড়ে বিজলী পিছিয়ে যায়। ওরা আসে আর

আসে আর আসে। এ আসার শেষ নেই। ফুরিয়ে যায় আহার। শব্দ করে উল্টে যায় ড্রাম। ওরা জিব দিয়ে চাটে। মাটি। পাতা। ড্রাম। বালতি। তাপে জিব পুড়ে যায়। তোলে না। থামে না। ক্ষুধা মেটায়।

স্থির নির্বাক ফাদার হোমস্ আর ফাদার ব্যানার্জি। শুধু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন বিজলীর দিকে। সে কিন্তু তাকায় না ওঁদের দিকে। আস্তে আস্তে চলে যায় সেখান থেকে।

চাবিটা আর সঙ্গে নিয়ে যায় না বিজলী। গেটের তালাতেই লাগিয়ে রেখে যায়।

॥ দশ ॥

সাদা কাপড়ের আচ্ছাদন। দীর্ঘ কালো চুল। চোখে নেমে এসেছে গভীর ঘুম। মুখে অল্প অল্প হাসি আর বুকে ছোট একটি বাইবেল .....

এই কবর থেকে এক-একটি করে ইট সরিয়ে নিলে, অনেকবার আঁজলা ভরে মাটি তুলে নিলে কী দেখবে বসন্ত? সে দেখবে কালো কফিন। আগ্রহের উত্তেজনায় মুহূর্তে ডালা খুলে ফেলবে সে। দেখবে সরলার ঘুমন্ত মুখ। ঠিক তেমনি আছে—যেমন ছিল অনেক দিন আগে।

কোনো নিপুণ কারিগর যেন সরলাকে মাত্র একটি গভীর রেখা টেনে এঁকে রেখেছে বসন্তর মনের মাঝখানে। কতটুকুই বা ব্যবধান—একটি একটি করে শুধু ইটগুলো সরিয়ে ফেলা।

সরলার ঘুম ভাঙাবে বসন্ত। আস্তে। সাবধানে। চোখে হয়তো প্রথমটায় ধাঁধা লেগে যাবে সরলার। মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে জাগবে বিস্ময়। অন্ধকার থেকে আলোকে আসার মতো।

চিনবে বসন্তকে। খুঁজবে শ্যামুয়েল আর বিজলীকে। রেণুকে প্রথম দেখবে সরলা। আবার হাসি ফুটে উঠবে তার মুখে। কথা বলবে। মাথায় কাপড় দিয়ে আবার গির্জে যাবে। শেষ হবে দৈন্যের, হাহাকারের আর সংসারের বিশৃঙ্খল অবস্থার।

মাটির তলা থেকে সরলাকে তুলে আনবার জন্যে ব্যগ্র হাতে

কবরের তাজা ঘাস ছেঁড়ে বসন্ত। কাঁদে। মুখ থুবড়ে পড়ে মাটির ওপর। জোরে ডাকে সরলাকে। ঘুম ভাঙাতে চায়।

উঠুক। জাগুক। ভাগ নিক বসন্তর বুক-ভরা দুঃখের।

বসন্তর দৃঢ় বিশ্বাস মাটির তলা থেকে সরলাকে যদি জোর করে আবার ফিরিয়ে আনা যায় সংসারে তাহলে এত দুঃখ থাকবে না—এত অভাব থাকবে না। মাত্র একজন নেই বলেই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে তার সংসার। সরলার হাতের স্পর্শে চারপাশ সুন্দর হয়ে উঠবে আবার—সুশৃঙ্খল হয়ে উঠবে।

অভিমানে বসন্তর বুকটা দৃঢ় পেশী বর্ষার মেঘের মতোই ফুলে ওঠে। কেন মাটির নিচে অন্ধকারে অকাতরে ঘুমিয়ে থাকবে সরলা। কেন আলার মাঝে উঠে এসে তার পাশে দাঁড়াবে না—সুখ দুঃখের কথা শুনিয়ে বুক হালকা করতে দেবে না! কেন বিজুকে বকবে না, শমুকে দেখবে না, রেণুকে সান্ত্বনা দেবে না।

বিজলীকে কটু কথা বলবার সাহস হয় না বসন্তর, কিন্তু তাকে বোধ হয় একটু বকে দেয়া দরকার এখন। মাথার দোষ হয়েছে মেয়েটার। পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে নাকি বিবাদ করেছে। তাকে মানে না, তার কথা শোনে না। শমুর সঙ্গে সারাদিন গুজগুজ করে যা খুশি তাই কবে।

যুদ্ধের চাকরি যাবার পর শমুটাও কেমন এক অদ্ভুত ধরনের মানুষ হয়ে গেছে। একটা কাজ দিতে চেয়েছিল পাদ্রীসাহেব। নেয় নি। বলে তার নাকি সময় হবে না গির্জে বসে দিনের পর দিন চাঁদার হিসেব রাখবার।

কী এমন মহা কাজে ব্যস্ত শ্যামুয়েল বসন্ত বুঝতে পারে না। সারাদিন তো বাড়িতে বসে দাস সাহেবের লোকদের সঙ্গে জটলা করে। চিঠিও লেখে ওদের হয়ে। কী লেখে, কাকে লেখে ঈশ্বর জানে।

মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে যায়। বাড়ি

ফেরে অনেক রাত করে। দিনকাল খারাপ। অতক্ষণ শ্যামুয়েলের বাইরে থাকা ভালো লাগে না বসন্তর। কিন্তু বারণ করবে কাকে। বারণ করলে শুনবে কে। সরলা না থাকায় যা-সব কাণ্ড ঘটছে সংসারে!

তবু রেণুকে না বলে পারে না বসন্ত, খোঁড়া মানুষটা এত রাত অবধি একা একা বাইরে ঘুরে বেড়ায়, তুমি মানা করতে পার না?

কথা শুনে হেসে ওঠে রেণু, একা একা বাইরে ঘুরবে কেন বাবা? অনেক লোকের সঙ্গে ঘরের মধ্যে বসে সুখ-দুঃখের গল্প করে বলেই তো জানি—

তা রাতে কেন? দিনের বেলা গল্প করা যায় না বুঝি?

দিনের বেলা কী করে হবে বাবা? ওদের কাজ থাকে যে। দাস সাহেবের আপিসে কাজ করে না সকলে?

নিশ্বাস ছেড়ে বসন্ত বলে, হুঁঃ! সকলের কাজ আছে। শমুটাই দেখি শুধু গল্প করে কাটায়। অমন আরামের কাজটার জন্যে সাধাসাধি করল পাদ্রী সাহেব—কেন নিল না ওই জানে—

রেণু বলে, এ-কাজটায় খাতির কত বেশি বাবা। ওরা সকলে মিলে যেন মাথায় করে রাখে!

শুধু মাথায় চড়ে বসে থাকলেই হল? পয়সা-কড়ি রোজগার করতে না পারলে চলে নাকি পুরুষ মানুষের?

বাঃ, পয়সা-কড়ি পায় না বুঝি? ওরা অমনি কাজ করিয়ে নেয় ভাবেন নাকি আপনি? ওরা সকলে মাইনে পেয়ে বিপদ-আপদের জন্যে কিছু কিছু জমা রাখে ওর কাছে। জটাধর আর নটবর আগে যেখানে কাজ করত সেখানে মিস্তিরীদের মধ্যে নাকি এমন ব্যবস্থা ছিল। এখানেও ওটা চালু করেছে ওরা—

তা শ্যামুয়েলের কী? ও তো আর কাজ করে না দাস সাহেবের আপিসে। পয়সাই নাই নিজের, জমাবে কী?

ওদের জমার হিসাব রাখে ও। তার জন্যে পয়সাও পায়। যা পারে ওরা একসঙ্গে সকলেই দেয় ওকে মাস মাস কিছু কিছু করে—

যত বাজে খেয়াল শমুটার। তার চেয়ে দাস সাহেবের আপিসেই বলে-কয়ে একটা কাজ নিলেই হত। বসে বসে না-হয় কাজ করত এক কোণায়—

জানেন না বুঝি বাবা, ওর যে ঢোকা বারণ দাস সাহেবের আপিসে।

কেন? রেণুর কথা শুনে অবাক হয়ে যায় বসন্ত।

একদিন ওদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল আপিসে। ভুবনবাবু তাড়িয়ে দেয়। বলে, ফের গেলে নাকি পুলিসে দেবে।

বসন্ত বিশ্বাস করতেও চায় না রেণুর কথা। চোর নাকি শ্যামুয়েল যে তাকে পুলিসে দেয়া হবে। আসলে কাজে মন নেই ছেলের তাই শুধু কাজের লোকদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করে দিন কাটায়।

একটাই তো ছেলে বসন্তর। যুদ্ধ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে তাই ঢের। আবার একটা পা নেই। তাকে মুখের ওপর কাজের কথা বলতে সঙ্কোচ হয় বসন্তর। অভাবে মাথা ঠিক থাকে না বলেই রেণুকে এসব বলে।

কিন্তু বিজলী হঠাৎ কেন কাজটা ছেড়ে ছিল সে-কথা অনেক ভেবেও বুঝতে পারে না বসন্ত। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে ম্লান হাসে। কথা বলে না। না ছাড়লেও নাকি তার কাজটা থাকত না আর বেশি দিন। পাদ্রী সাহেব অপ্রসন্ন হয়েছে তার ওপর। তাই বিজলী নিজেই আগে থেকে সতর্ক হয়ে কাজটা ছেড়ে দিয়েছে।

সরলা নেই। শ্যামুয়েল কিছু বলে না। বসন্তর কথা শোনে না। যার যা খুশি করে আজকাল। কে বাধা দেবে। কে বোঝাবে। বিজলীর কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল বসন্ত। পাদ্রী সাহেবের অবাধ্য হলে ঈশ্বর তাকে যে কিছুতেই ক্ষমা করবে না সে-কথাটা কেন বোঝে না মেয়েটা!

বিজলী বলে, যার ক্ষমতায় বিশ্বাস নেই তার সেবা করতে পারব না, তাকে ভক্তি করতে পারব না—

কার ক্ষমতায় বিশ্বাস নেই তোর?

শূন্য দৃষ্টিতে বিজলী তাকিয়ে থাকে বসন্তর মুখের দিকে। জানে, শুনলে কঠিন আঘাত পাবে বাপ তাই আসল কথাটা ভাঙতে ইতস্তত করে।

আবার বসন্ত বলে, সাহেব বলছিল, না বলে-কয়ে কাজটা ছেড়ে দিলি তুই, মতিগতি নাকি ভালো নয় তোর। দিয়াবল তোর মনে ঢুকেছে—

বিজলী ম্লান হাসে, কাজ আর-একটা ঠিক করে নেব বাবা। এবার অন্য ধরনের কাজ নেব। বেশি মাইনে। যুদ্ধের সময় কাজ পাওয়ার ভাবনা কী মেয়েদের?

সচেতন হয়ে ওঠে বসন্ত, না না, যুদ্ধের চাকরি নেবার কোনো দরকার নেই তোর। না খেতে পাস তাও ভালো—

বিজলী বলে, কিন্তু কাজ তো চাই একটা—

পায়ে পড় গিয়ে পাদ্রীসাহেবের। কী যে মেজাজ হয়েছে আজকাল তোর বিজু বুঝি না। অত করে আমাদের জন্যে সাহেব, তার অবাধ্য হতে হয় কখনও?

আমি ঈশ্বরের কথা শুনেছি বাবা।

এবার অপ্রসন্ন হয় বসন্ত, যা বিজু যা, সাহেবের পায়ে পড়ে মাপ চেয়ে নে—

না বাবা—

না মানে? নরকে যাবি নাকি?

বিজলী হাসে, হ্যাঁ।

বলিস কী বিজু? প্রাণে একটু ভয়-ডর নেই তোর। নরকে যাবার কথা বলতে মুখে আটকায় না?

বসন্তর কথার উত্তর দেয় না বিজলী। বাপকে বলতে পারে না চারপাশ থেকে যে আর্তনাদ ভেসে আসে তার চেয়ে বেশি চিৎকার হয়তো নরকেও শোনা যায় না। আজকের চেয়ে বেশি ক্ষুধা দুঃখ আর যন্ত্রণা আর কোথাও থাকতে পারে না বলেই দৈবশক্তির ওপর বিশ্বাস শিথিল হয়ে আসে বিজলীর।

বসন্ত বলে, যা বিজু যা, পাপ স্বীকার করে প্রভুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নে। কেন শুধু শুধু নরকে গিয়ে ভুগতে চাস তুই?

নরকেই তো আছি বাবা, থেমে থেমে বলে বিজলী, কোনো পাপ করি নি আমরা, তবু তো নরকবাসের দিন শেষ হয় না—

শান্তস্বরে বসন্ত বলে, ও-কথা বলিস না বিজু। বেঁচে তো আছি। রাস্তায় পড়ে মরতে তো হয় নি এখনও। প্রভুর ওপর বিশ্বাস আছে বলেই না—পাদ্রী সাহেব আছে বলেই না—

কথা বলে না বিজলী। পাপ স্বীকার করতেও ছুটে যায় না পাদ্রী সাহেবের কাছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপচাপ কী ভাবে। যারা মরছে তাদের কি বিশ্বাস নেই ঈশ্বরের ওপর? নাকি পাদ্রী সাহেব চোখে দেখতে পায় না ওদের?

তবে কেন দুঃখ ঘোচে না?

তবে কেন ক্ষুধা মেটে না?

হঠাৎ কখন অন্ধকার নামে। দূরে বড় বড় গাছের সারি ছায়ামূর্তির মতো মনে হয়। হাওয়ায় পাতা দোলে। শনশন শব্দে মধুর আমেজ লাগে বসন্তর মনে। বান ডাকে রক্তে। সে

ব্যাকুল হয়ে ওঠে সরলাকে দেখবার আগ্রহে। কতদিন যে সে সামনে এসে দাঁড়ায় না তার!

সমস্ত জগৎ যেন লুপ্ত হয়ে গেছে—নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বসন্তর অনুভূতির জোয়ারে। শুধু একটি মানুষের স্বর স্পষ্ট শুনতে পায় বসন্ত।

কেন সে উঠে আসে না ওপরে!

সরো, কাছে এসো—সরো, উঠে এসো। বুড়া বয়সে আর আমি সব করতে পারি না। আমার চোখের জল মুছিয়ে দাও। কে দেখবে আমাকে! তুমি এসে আমার ব্যথা জুড়িয়ে দাও—

তবু আসে না সরলা। তবু দুঃখ বোঝে না বসন্তর। দুজনের মাঝখানে শুধু মাটি। ব্যবধান ঘুচে যায় না বসন্তর আকুল মিনতিতেও। মাটি আঁকড়ে সে ফোঁপাতে থাকে।

হাত তোলে। হাতের মুঠোয় কচি ঘাস আর নরম মাটি। নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রাণ নেয় বসন্ত। সরলার সুবাস যেন আছে ঘাস আর মাটিতেই।

হঠাৎ স্থির হয়ে যায় সে। উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। শান্ত হয়ে কান পেতে রাখে মাটির ওপর। কোনো শব্দ নেই। মানুষের কোলাহল শোনা যায় না এখানে। নির্জন অন্ধকারে ঝাউ-এর মর্মর একটানা ক্রন্দনের মতো বাজে বসন্তর কানে।

কিন্তু মাটিতে কান পেতে আর-এক অদ্ভুত শব্দ শুনতে পায় বসন্ত। পাতার ক্রন্দন নয়, মাটির তলায় কে যেন যন্ত্রণায় ছটফট করছে, সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করছে ওপরে উঠে আসতে।

অন্ধকারে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বার বার আঘাত খেয়ে টলে পড়ছে। তবু মাথা তুলতে চায়। দুই হাতে অন্ধকার ঠেলে ওপরে উঠে আসতে চায়।

সরো, ডাক ছেড়ে কাঁদে বসন্ত, আমি আর শুনতে পারি না। হা ঈশ্বর! জোর নেই গায়ে। প্রভু শক্তি দাও—আমি এই পাথর

ভেঙে ফেলি—ইট তুলে ফেলি। মাটি খুঁড়ে বাক্সসুদ্ধ উপরে তুলে নিয়ে আসি—

বসন্ত মাথা ঠোকে ঘাস আর মাটিতেই।

পেঁচা ওড়ে। বাদুড় ঝোলে জলপাই-এর গাছে। পাশের কবরটার ওপর কে রেখে গেছে গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধা। এলোমেলো হাওয়ায় গন্ধ এসে লাগে বসন্তর নাকে।

বিজলী এসে দেখে একটা মানুষ ঘুমিয়ে রয়েছে তার মায়ের কবরের পাশে। ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়। অন্ধকারে বসন্তকে চিনতে দেরি লাগে। ডাকতে সাহস হয় না। যদি সাড়া না পায়। যদি—বড় ভীতু হয়ে গেছে বিজলী আজকাল।

বাবা, সাহস করে ডাকে বিজলী। এগিয়ে এসে আস্তে স্পর্শ করে বসন্তকে। যাক প্রাণটা আছে। অনেকক্ষণ বাপের গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে হয় না।

বসন্তর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আবার মায়ের কথা মনে পড়ে যায় বিজলীর। মনটা ভারী হয়ে যায়।

ঠিক কথাই বলে তার বাপ, কেউ মরে না। চোখের সামনে থেকে একটা মানুষ সরে যায় বটে কিন্তু আর-একজনকেও টেনে নেয় তার পিছনে। ঘর থেকে বাইরে আনে, নতুন পথ চিনিয়ে দেয়।

একজন ঘুমিয়ে পড়ে আর একজনকে জাগিয়ে দিয়ে যায়। নিজে দায় চুকিয়ে যাবার সময় আর-একজনের কাঁধে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়। তাই কাজ বন্ধ হয় না পৃথিবীর। জীবন-মৃত্যুর এই আদান-প্রদান আছে বলেই নিত্য নতুন কাজ হারানোর দুঃখটা ভুলিয়ে দেয় মানুষের।

সরলা নেই। কিন্তু শ্যামুয়েল আছে, বিজলী আছে, রেণু আছে বলেই সংসারে প্রয়োজন আছে বসন্তর। আর তা আছে বলেই

সরলাকে ভুলতে পারে না। যুদ্ধে দুর্ভিক্ষে অনিদ্রায় উপবাসে—কিছুতেই না। অভাবে সুখ নেই বলেই বোধ হয় বসন্তর মনের যন্ত্রণায় নিবিড় সান্ত্বনা হয়ে সরলা বেঁচে থাকে।

বিজলী ভাবে, বয়সটা যদি অনেক কম হত তার বাপের আর ওলট-পালট সংসারটা গুছিয়ে আনবার ক্ষমতা থাকত তাহলে তার মা কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারত না এই নিঃঝুম অন্ধকার কবর-খানায়। কাজের বোঝা বসন্তর মাথায় চাপিয়ে পাশে পাশে ঘুরে ফিরত অনেক মানুষের ভিড়ে। কোলাহলের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা একা এখানে এসে বসন্ত ঘুমিয়ে থাকতে পারত না কিছুতেই।

বাবা—ও বাবা, বিজলী ডাকে। বাপের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

কে? বিজু? তাড়াতাড়ি উঠে বসে বসন্ত, ইস! কত রাত হয়ে গেছে—চল—উঠতে গিয়ে আবার বসে পড়ে। শরীরটা দুবল মনে হয়। স্বপ্ন দেখে কেঁদেছে বোধ হয়। চোখে জলের দাগ।

কী হল বাবা? অমন কর কেন?

জোর করে ওঠবার চেষ্টা করে না বসন্ত। বসে বসেই নিশ্বাস ফেলে। মাথা গোঁজে মেয়ের বুকে, ও মা বিজু, বড় কষ্ট তোর মায়ের। মাটির নিচে থাকতে পারে না। দম বন্ধ হয়ে আসে। ওপরে উঠে আসবার জন্যে ছটফট করে। বল মা বল, কী করি আমি?

কথা শুনে বিজলীরও দম বন্ধ হয়ে আসে। সে নিজেও ছটফট করে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে। বাপের হাত ধরে জোর করে উঠিয়ে বলে, বাবা বাড়ি চলো।

তোর মার দুঃখে বুক ফেটে যায় বিজু। আয় মাটি খুঁড়ে আমরা ওপরে তুলে আনি তাকে—

বসন্তর হাত ধরে তাকে আস্তে আস্তে টানতে থাকে বিজলী। বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়। যেতে যেতে বার বার পিছন ফিরে তাকায়। যত কবর চোখে পড়ে প্রত্যেকটির দিকে দৃষ্টি বুলোয়। যত প্রাণ আছে নিচে বিজলীকে ডাকে দুর্ভিক্ষের সেই মানুষগুলির মতো। পাষাণ ভেদ করে তলা থেকে মাটির ওপর উঠে দাঁড়াতে চায়। প্রাণের আবেদনে প্রাণ কাঁদে বিজলীর। সে থামে। কী ভাবে। আবার চলে।

মাথার ওপর আকাশটা যেন অনেক বড় হয়ে গেছে। কবরখানা থেকে চিরদিনই বড় দেখায় বটে। হঠাৎ আকাশ থেকে কবরখানাটাকে দেখতে সাধ জাগে বিজলীর। কত ছোট দেখাবে কে জানে।

হয়তো এই অন্ধকার জায়গাটুকু খুঁজেই পাওয়া যাবে না তখন।

সেদিনের সূর্য বেশি আলো দেয়। সেদিনের বাতাস অনেক জোরে বয়। বয়সটা হঠাৎ যেন কমে গেছে বসন্তর। ভারী জিনিসগুলো এ-ঘর থেকে ও-ঘরে সরাতে এতটুকু কষ্ট হয় না। দেহে আবার যৌবন ফিরে এল বোধহয়।

চৌকিটা টেনে ঘরের কোনায় রাখে বসন্ত—সরলার আমলে যেমন ছিল। কাচের ময়লা ফুলদান পরিষ্কার করে তাজা ফুল ভরে দেয়। বালতি বালতি জল এনে নিজেই ঢালে মেঝের ওপর। ধোপার বাড়ি গিয়ে শ্যাওলা রঙের সেই কোটটা তখুনি ইস্তিরি করে দিতে বলে।

ব্যাপার বুঝতে পারে না রেণু। বসন্তর ছুটোছুটি দেখে ভাবে বিজলীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল নাকি। কিছু না জেনেই শ্বশুরকে সাহায্য করতে ছুটে আসে। ভারী টেবিলটা ধরাধরি করে সরাতে যায়।

শ্বশুরকে রেণু জিজ্ঞেস করে, কেউ আসবেন নাকি বাবা আজ?

হাসে বসন্ত। গালে হাত বুলোতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হয় দাড়ি কামানো হয় নি অনেকদিন। রেণুর প্রশ্নের জবাব দেয় না। ছেলের বউএর সামনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লজ্জা পায়। একটা ভাঙা কাচের গেলাস নিয়ে মরচে-ধরা পুরনো ক্ষুরটা ধার দিতে বসে। আপন মনে হাসে।

আসলে কী হবে আজ সে-কথা কাউকে বলতে সঙ্কোচ হয় বসন্তর। আজ সে আবার সরলাকে দেখবে। মাটি খুঁড়তে হবে না তাকে—কবর খুঁড়বে দাস সাহেবের লোক। নতুন কফিন নামানো হবে সরলার কবরে।

এমন প্রায়ই হয়। কেন এতদিন কবর খোঁড়বার কথাটা খেয়াল হয় নি বসন্তর সে বুঝতে পারে না। তার মনেই থাকে না যে এতদিন হয়ে গেছে। সময় হলে নতুন কফিন নামে পুরনো জমিতে। দাম দিয়ে জমি কিনে শুধু নিজের পরিবারের মানুষগুলির কফিন ভবিষ্যতে নামাবার ব্যবস্থা করে রাখতে তো আর পারে না ওরা, তাই জমি খোঁড়া হয় অন্যের প্রয়োজনে।

দাস সাহেব জমি কিনে রেখেছে অনেক। সে-জমিও খোঁড়া হবে সময় হলে। কিন্তু শুধু পরিবারের মানুষগুলির জন্যে। অনাত্মীয়ের সমাধি হবে না কখনও সেখানে।

বিশ্বাসদের বাড়ির ছোট মেয়েটা ভারী অসুখে ভুগে ভুগে কাল রাতে মারা গেছে। আজ বিকেলে সরলার কবর খুঁড়ে নামিয়ে দেয়া হবে তার কফিন। ভোরবেলা বেন আর জোসেফ এসেছিল কবরখানায় জমি দেখতে। তাদের কাছেই খবর পেয়েছে বসন্ত। তখুনি ছুটে এসেছে বাড়িতে। খুশিতে আর উচ্ছ্বাসে এই অল্প সময়ের মধ্যে সোজা হয়ে গেছে বৃদ্ধের বাঁকা শরীর!

কথাটা বলতে ইতস্তত করেছিল জোসেফ। ভেবেছিল বোধ-হয় দুঃখ পাবে বসন্ত। বোকা বুঝি লোকটা। অল্প বয়েস কিনা

তাই ঠিক জানে না দুঃখ আর আনন্দের প্রভেদ। সরলার কবরেই যদি বিশ্বাসদের ছোট মেয়েটাকে নামানো হয় তাহলে দুঃখে বুক ভেঙে যাবে কেন বসন্তর। সরলাকে ওপরে উঠিয়ে আনবার জন্যে কদিন থেকে তার যে ভাবনার শেষ নেই সে-কথা জানে না জোসেফটা।

মরেও সুখ নাই, শুকনো দৃষ্টিতে বসন্তর দিকে তাকিয়ে জোসেফ বলে, ভুগে ভুগে জীবন শেষ হয়—মরলেও টানাটানি—খাও কোদালের ঘা- -

কী হল রে জোসেফ? বসন্ত হাসে, জমি দেখতে এসে ভোর বেলায় গরম হয়ে গেলি যে?

চুপ করে থাকে জোসেফ। পকেট থেকে ফিতে বের করে বেনের হাতে একটা কোণ ধরিয়ে দিয়ে পিছিয়ে আসে, শ্যামুয়েলের মায়ের কবরটাই খুঁড়তে হবে। সাহেবের অর্ডার, খাতায় জমির মাপ লিখতে লিখতে জোসেফ অভিযোগ করে, আর জায়গা নাই নাকি এত বড় কবরখানায়!

মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নেয় জোসেফ। কবরখানায় সরলার স্মৃতি বুকে নিয়ে ভোর থেকে লোকটা বসে আছে দেখে কথাটা জানাতে দ্বিধা হয়। বসন্তর প্রশ্ন করবার ধরনটাও বড় করুণ মনে হয়।

এই জোসেফ? তার হাতটা ঝাঁকিয়ে দেয় বসন্ত, বল না? বোবা হয়ে গেলি নাকি?

বুক বাঁধ দাদা, কথাটা বলেই ফেলে জোসেফ, বিশ্বাসের বেটি মরেছে না? এই কবরেই কবর দেয়া হবে তাকে আজ বিকালে—

তার কথা শেষ না হতেই আহ্লাদে বলে ওঠে বসন্ত, ঠিক? ঠিক কথা বল জোসেফ?

হ্যাঁ দাদা, বসন্তর ভাবান্তরের কারণ খুঁজে পায় না জোসেফ।

ভাবে মাথাটা পুরোপুরি ভালো হয় নি এখনও শ্যামুয়েলের বাপের। একথা শুনে তো রেগে যাওয়ার কথা। উল্লসিত হওয়া সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ নয়। মাপ নেয়ার কাজটা শেষ করে ফেলে জোসেফ।

কটার সময় বেরিয়েল হবে বিশ্বাসের মেয়ের? আগ্রহ উপচে পড়ে বসন্তর মুখে।

পাঁচটা নাগাদ।

দেরি যেন সয় না বসন্তর, একটা ছোট কফিন বানাতে বেলা কাবার করে দিস তোরা। তোদের মতো বয়সে এক দু ঘণ্টায় কাজ শেষ করেছি আমি।

যেন কফিন বানিয়ে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে কবর খোঁড়া হবে— যেন জোসেফের জন্যেই বিলম্ব হচ্ছে অনুষ্ঠানের। তার দিকে বসন্ত তাকিয়ে থাকে। অপদার্থ বলেই মনে করে হয়তো।

হেমন্তের শিশিরের ওপর কচি রোদ ঝলসায়। সুরকির রঙ আরও গাঢ় দেখায়। গাছের নতুন পাতাও সরলাকে দেখবার আগ্রহে উন্মুখ হয়ে থাকে।

বসন্ত কবরখানা থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়।

•

ওপরের উঁচু দেয়ালে তখনও রোদ লেগে থাকে। এপারে ছায়া নেমেছে। সকলের চেয়ে আগে কবরখানার গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বসন্ত। তার ঘড়ি নেই কিন্তু সে জানে আজ সময় তাকে ফাঁকি দিয়ে পার হয়ে যেতে পারে না। এখনও পাঁচটা বাজতে দেরি আছে।

একটু পরে ছোট একটা কফিন বয়ে নিয়ে আসবে কাচ দিয়ে ঘেরা কালো মোটর গাড়ি—হার্স। গাড়ি দাঁড়াবে এই গেটেরই সামনে। হার্স ঢোকে না কবরখানার ভেতরে। এখানেই বিশ্বাসের মেয়ের ছোট কফিন গাড়ি থেকে নামিয়ে পপরিরা

কাঁধে তুলে নেবে। এগিয়ে যাবে সরলার কবরের দিকে। প্রার্থনা করবে পাদ্রী সাহেব।

তখন বসন্তর দেখা হবে সরলার সঙ্গে। সকলের সামনেই তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বসন্ত। হেমন্তের ঠাণ্ডা নরম আলোয় এতদিন পর আবার দেখবে—

সাদা কাপড়ের আচ্ছাদন। দীর্ঘ কালো চুল। চোখে এসেছে গভীর ঘুম। মুখে অল্প অল্প হাসি আর বুকে ছোট একটি বাইবেল······

দুঃখের দিন শেষ হবে বসন্তর।

বাইরে ফুলওয়ালার ভিড় জমেছে। তাদের ঝুড়িতে ফুলের ক্রশ আর অনেক রকম ফুল। ওরা চিৎকার করে না। চুপচাপ বসে থাকে। বসন্তর ইচ্ছে হয় সরলার জন্যে একটা বড় মালা কিনতে। কিন্তু দাম জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না! যদি ফুলওয়ালা বেশি দাম বলে আর পয়সা কম পড়ে যায় তাহলে মনটা খারাপ হয়ে যাবে তার।

কবরখানার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে অনেকদিন পর বসন্ত ভালো করে চারপাশে তাকিয়ে দেখে। যেন এই প্রথমবার এখানে এসেছে—যেন এতদিন এসব কিছুই ওর চোখে পড়ে নি। রাস্তায় ট্রাম বাসের শব্দ, জনতার কোলাহল, গরুর গাড়ির চাকার আওয়াজ একটা নতুন জগৎ তুলে ধরে বসন্তর চোখের সামনে। ওপারে অনেক মাংসের দোকান। ক্রেতা-বিক্রেতায় কলহ বাধে। এদিকে দাঁড়িয়ে বসন্ত হাসে। কতদিন যে সে মাংস কিনে নিয়ে যায় নি বাড়িতে!

ছোট একটা হার্স আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে। হার্বাট চালাচ্ছে নিশ্চয়ই। পা-দানের উপর পপরিবা দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখ দেখতে পাচ্ছে না বটে বসন্ত তাদের কিন্তু সে বুঝতে পারে. ওরা হোরেস আর সিরিল। কালো লম্বা চেহারা। ছোট হার্স

বলে বোধহয় কেনেথ আর ডেভিড আসে নি। বিশ্বাসবাবু আর বিশ্বাস-গিন্নী হার্সের সঙ্গে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে। রুমাল দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ মুছছে দুজনেই। সঙ্গে ওদের বড় জামাই আর বড় মেয়েও আছে। হাতে অনেক ফুল।

কবরখানার গেটের সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই বসন্ত তাড়াতাড়ি কাছে ছুটে আসে। উত্তেজনায় বুকের কাঁপন দ্রুত হয়। কথা বলে না কেউ। নীরব শোক থমথম করে। কিন্তু প্রসন্ন হয়ে ওঠে বসন্তর মুখ। সরলাকে দেখবে সে এবার।

ছোট কফিন কাঁধে নিয়ে জেমস আর সিরিল সাবধানে পা ফেলে হাঁটে। বসন্ত যায় আগে আগে। একটু তাড়াতাড়ি সে হাঁটে বোধহয়। সঙ্গে চলেছেন ফাদার ব্যানার্জি। গম্ভীর বিষণ্ণ তাঁর মুখ। সকলকে দেখেও শোকের রেখা পড়ে না বসন্তর মনে। মৃত্যুর পিছন থেকে এক নতুন জীবন আসছে তার কাছে। অধীর আগ্রহে সে তারই প্রতীক্ষা করে।

সরলার কবরের পাশে কফিন নামিয়ে হাত দিয়ে কপালের ঘাম মোছে হোরেস আর সিরিল। শাবল মারে মাটির বুকে। শব্দ হয়। এই আওয়াজেই সরলার ঘুম ভাঙবে। আবেশে বসন্ত ঘুমিয়ে পড়তে চায় মাটির ওপর।

অনেক নতুন পাতা গজিয়েছে জলপাই-এর শাখায়। টুপটাপ ঝরে পড়ে হাওয়ায়। অপরাহ্ণের গৈরিক আলোয় রঙ খুলেছে গোলাপের পাপড়ির। শিশিরে ভিজে কঠিন মাটি নরম হয়েছে। বেশি পাখি ডাকে। বেশি ফুল ফোটে। আলো থাকে বেশিক্ষণ।

শ্রবণ প্রখর হয় বসন্তর। কান পেতে একমনে সে শুধু শোনে মাটি আর শাবলের গান—ঠুন-ঠুন ঠক-ঠক। সময় কাটে না। সময়ের গতি মন্থর হয়ে গেছে আজ।

একদৃষ্টিতে বসন্ত তাকিয়ে থাকে মাটির দিকে। ঝুঁকে পড়ে দেখে। ভাবে, কখন শেষ হবে এই খনন। হাত চালাতে বলতে

চায় হোরেস আর সিরিলকে। এত সময় নেয় কেন ওরা। তার ইচ্ছে করে ওদের হাত থেকে শাবল ছিনিয়ে নিয়ে নিমেষে সরলাকে ওপরে তুলে আনে। কিন্তু ঠোঁট কাঁপে বসন্তর। কথা বলতে পারে না। হাত ওঠাতে পারে না প্রবল উত্তেজনায়।

খুব জোরে ঠক করে শব্দ হল। এখানেই শেষ করতে হবে খনন—সে-কথা ফাদার ব্যানার্জিকে জানিয়ে হোরেস আর সিরিল প্রার্থনার ভঙ্গিতে একদিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সরো—কই- সরলা—দুরন্ত বেগে সেই খোঁড়া কবরের ধারে ঝাঁপিয়ে পড়ে বসন্ত। তীব্র উৎকট গন্ধ নাকে লাগে। শুধু জমাট অন্ধকার আর বোধ হয় পাথরের কুচি মেশা শক্ত মাটি। পপরিরা ধরে না ফেললে সে পড়ে যেত কবরের মধ্যে।

কখন যে প্রার্থনা হয়ে গেছে বসন্ত বুঝতে পারে নি।

পপরিরা খুব সাবধানে নতুন কফিন নামাচ্ছে।

॥ এগারো ॥

দুর্ভিক্ষের সেই শীর্ণ মানুষগুলির করুণ চিৎকার আর শোনা যায় না। পথেও দেখা যায় না তাদের। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তিলে তিলে শেষ হয়ে গেছে তারা। তবুও লোক বেঁচে আছে—যারা শেষ হয়ে গেছে তাদের চেয়ে অনেক বেশি লোক।

যুদ্ধ চলছে বটে এখনও কিন্তু তত উত্তেজনা নেই মানুষের মনে। জীবন আর মৃত্যুর সংগ্রামে অনেকদিন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব সয়ে গেছে এখন। আর সাইরেন বাজে না। যদি হঠাৎ কখনও বা বাজে তাহলে চমকে ওঠে না কেউ। ভয়ও পায় না। সতর্কতা অবলম্বনের রীতিটাও অনেক শিথিল হয়ে গেছে।

কঠিন অসুখে তিন-চার মাস শয্যাশায়ী ছিল বসন্ত। মুখে এক কথা, কেউ নেই। কিছু নেই। সব ভুল। সব মিথ্যে। সরো—ফিরে এসো। সরো—আমায় ডেকে নাও!

রেণু আর বিজলীর প্রাণপণ সেবায় বেঁচে যায় বসন্ত। কিন্তু খুব দুর্বল শরীর। রোদ লাগলে মাথা ধরে। চলতে গেলে হাঁপায়। ক্ষিধেও হয় না তেমন।

দাস সাহেবের অফিসের প্রত্যেকটি লোক নিয়ম করে দেখতে আসে। মাথার কাছে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। চেহারা দেখে কে বলবে সারাদিন পরিশ্রম করে এসেছে। যেন শ্যামুয়েলের বাপকে সবল করে তুলবেই তারা।

ডাক্তার হ্যারি মণ্ডল সময়মতো দেখে যায়। বড় বড় ওষুধের নাম লিখে দেয় ছোট ছোট কাগজে। বলে, অবস্থা এখনও ভালো

নয় রুগীর, ওষুধটা তাড়াতাড়ি আনিয়ে নেয়া দরকার। ব্যাগ ঝুলিয়ে ডাক্তার চলে যায়। টাকা নেয় না এদের কাছ থেকে।

বিজলী বলে, দাদা কী হবে?

রেণু বলে, বড় দাম ওষুধের।

শ্যামুয়েল চিন্তিত হয়ে পড়ে না। হাসে। বউ আর বোনকে আশ্বাস দিয়ে বলে, তোরাই তো সারিয়ে তুললি বাবাকে—তোরাই আবার তাজা করে তুলবি—ভাবনা কী রে বিজু!

যত বড় বিপদ মাথার ওপর নেমে আসুক না কেন, সত্যিই শ্যামুয়েল এখন আর একেবারেই ভাবনা করে না বটে। মানুষকে সব সময় আশ্বাস দেয়া তার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ মানুষের কাছ থেকে সে নিজে আশ্বাস পেয়েছে বলেই তার মনে থাকে না যে একটা পা নেই।

শ্যামুয়েলের অনেক দায়িত্ব বেড়েছে এখন। শুধু তার সংসারের দায়িত্ব নয়, দাস সাহেবের অফিসের প্রত্যেকটি লোকের কথা ভাবতে ভাবতে সে নিজের কথাই ভুলে যায়।

কিছু কিছু করে টাকা ওরা শ্যামুয়েলের কাছেই জমা রাখে যেমন পারে তেমন। কিন্তু টাকাটা নিজের ঘরে রাখতে চায় না শ্যামুয়েল। বলে, যদি মরে যাই কী হবে? যদি চুরি যায় কী হবে? তার চেয়ে ব্যাঙ্কে রাখাই ভালো। সুদও তাহলে পাওয়া যাবে যা হোক—

কী কাজ এত হ্যাঙ্গামে, মধু বলে, খাতা তো করেইছ তুমি একটা। আমরা জানি কার কী জমা আছে।

শ্যামুয়েল হেসে বলে, কিন্তু সুদ?

দরকার নাই। সুদের লোভে কে ছুটবে ব্যাঙ্কে? ওই কটা তো মোটে টাকা।

বসন্তর দুর্বল শরীর বলে তার বাড়িতে বসেই কথা বলে এরা।

সুখ-দুঃখের গল্পও হয় অনেক। বেশি কথা বলে আমজাদ আব্দুল নটবর আর জটাধর। নতুন জায়গায় কাজ করতে এসে অনেক-দিন নাকি ভয়ে ভয়ে ছিল ওরা। বুঝতে পারে নি এরা কেমন মানুষ হবে। কথা বলবে কিনা। মতে মিলবে কিনা।

প্রথম প্রথম ওরা একটু দূরে দূরেই থাকত। গায়ে পড়ে কথা বলতে চাইত না এদের সঙ্গে। খোপে খোপে ভাগ করে রাখা হয়েছে বলে কথা বলবার তেমন সুযোগও হত না। ধর্মটা ভিন্ন বলেও বোধহয় ওরা ধরে নিত পরস্পরের মধ্যে মিল হবে না বেশি।

দাস সাহেবের অফিসে এখন নিয়ম-কানুন হয়েছে বটে অনেক। আগেকার মতোই সকাল সাড়ে নটায় প্রত্যেককে আসতে হয় কিন্তু রাত অবধি আর কাজ করতে হয় না। একটা থেকে দেড়টা জল-খাবারের ছুটি। এরা সকলে তখন বাইরে এসে জটলা করে। তেলে-ভাজা আর চা খায়। কেউ কেউ টিনের ছোট বাক্সে বাড়ি থেকে খাবার ভরে আনে। একটা থেকে দেড়টার মধ্যেই একদিন, এদের সঙ্গে ভাব হয়ে যায় আব্দুল আমজাদ জটাধর আর নটবরের।

এক ভাঁড় চা আব্দুলের দিকে এগিয়ে দিয়ে জেমস বলে, খাও।

হেসে হাত বাড়ায় আব্দুল, দেন।

মধু আমজাদকে জিজ্ঞেস করে, কেমন লাগছে কাজ?

হেঁ হেঁ, ভালো।

নটবরদা, অ্যালবার্ট বলে, বিড়ি দেবে নাকি একটা?

নাও না ভাই।

ও জটাধর, জোসেফ ডাকে, তেলে-ভাজা চাই নাকি?

দাও একটা, জটাধর কাছে সরে আসে জোসেফের।

কথায় কথা বাড়ে। আলাপও জমে ওঠে। ফরিদপুরে বাড়ি আব্দুলের। শিয়ালদায় একটা নীলামের দোকানে অল্প টাকায়

কাজ করত। মাইনে পেত না ঠিকমতো। তাই এখানে চলে এসেছে।

আমজাদের নিজের দোকান ছিল দিনাজপুরে। ছোট ছোট চেয়ার টেবিল তৈরি করে বেশ ভালো ভাবেই দিন চলত তার। যুদ্ধের হিড়িকে সব গোলমাল হয়ে গেল। কাঠের দাম চড়া। কাঠ কেনবার টাকা নেই তার। ওদিকে হঠাৎ কলেরায় উজাড় হয়ে যেতে বসল তার বংশ। ডাক্তার বদ্যি হাকিম কবরেজ সকলেই যেন লাফিয়ে লাফিয়ে যুদ্ধ করছে। কে ফিরে দেখবে তার দিকে। কোনোরকমে শুধু সে নিজে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসে কলকাতায়।

এখানেও একটা দোকান খোলবার চেষ্টা করেছিল আমজাদ। কিন্তু নতুন জায়গা। টাকা-পয়সাও নেই হাতে। তাই চাকরি নিতে হল। কাজটা ভালোই লাগে তার। মাথা খাটাবার দরকার নেই কোনো। কেরামতিও দেখানো যায় না। চোখ বুজে করাত চালিয়ে বাক্স বানাও। যদিও এই বাজারে খরচ চলে না তা হলেও পরিশ্রমের তুলনায় মাইনে বেশিই দেয় বই কি ভুবনবাবু। আমজাদের স্বরে দরদ প্রকাশ পায়। যেন ভুবন-বাবুই আসল মনিব। দাস সাহেব এ-আপিসের কেউ নয়।

বেশ মুশকিলের মধ্যেই ছিল জটাধর আর নটবর। বেকার বসে ছিল অনেকদিন। নাম-করা পাথরের কারবারী কুন্দনলালের দোকানে বড়বাজারে কাজ করত। লোকটা খাটাত যেমন, মাইনেও দিত তেমন। কিন্তু তার মেজাজটা ছিল রুক্ষ। কখন কাকে কী বলত খেয়াল থাকত না।

একদিন এক কর্মচারীকে কুন্দনলাল ঠাস করে মেরেই বসল এক চড়। বুড়ো মানুষ। পুরনো লোক। কয়েকটা টাকা আগাম চেয়েছিল মেয়ের অসুখের জন্যে। যুদ্ধের একটা বড় অর্ডার ফসকে সেদিন মেজাজ আরও খারাপ ছিল পাথরের

কারবারী কুন্দনলালের। কানেই তুলতে চায় না বুড়ো নারায়ণের কথা। তিন-চারবার ওই এক অনুরোধ শুনে মেরেই বসল তাকে।

ব্যাপার দেখে মাথায় যেন রক্ত চড়ে যায় প্রত্যেকের। ঘুসি পাকিয়ে তেড়ে যায় এরা দুজন। জটাধর আর নটবর। ভয়ে মুখ চুন হয়ে যায় কুন্দনলালের। আগাম টাকা দিয়ে দেয় বটে· নারায়ণকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুর্নাম দিয়ে কাজ খতম করে দেয় জটাধর আর নটবরের। বলে, এখুনি বেরিয়ে না গেলে পুলিসে ফোন করে জেলে পাঠাবে।

ভুবনবাবুর যাতায়াত ছিল কুন্দনলালের সেই পাথরের দোকানে। সেখানেই তার সঙ্গে এদের আলাপ। অনেকদিন পর একদিন পথে দেখা হয়ে যেতে নিজেই এদের এই কাজের কথা বলে ভুবনবাবু। বলেই বার বার সাবধান করে দেয় এখানকার কারুর সঙ্গে না মিশতে। এই আপিসের লোকগুলো নাকি ভালো নয়।

কথা শেষ করে হাসতে থাকে জটাধর আর নটবর। বলে, অনেক দিন বেকার বসে ছিল বলেই বাধ্য হয়ে এ-কাজ নেয় তারা, না হলে এত কম টাকায় সারা দিন ধরে পাথর কাটার কোনো উৎসাহই থাকত না তাদের। উপায় কী। যখন যেমন অবস্থা তখন তেমন ব্যবস্থা করে চলতে হবে তো।

মধু বলে, তা বটে।

অ্যালবার্ট বলে, ঠিক কথা।

জোসেফ বলে, হুঁঃ।

ঘণ্টা বাজে। ছুটি শেষ হয়। ওরা একসঙ্গে ভেতরে ঢুকে আবার যে যার খোপে আশ্রয় নেয়।

জটাধর আর নটবরের কাহিনী শুনে শ্যামুয়েল হেসে বলে, মুখোমুখি আর নয়—বুঝলেন? মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে হবে সব সময়, বেশ গম্ভীর হয়ে সে বলে যায়, মাথা-গরম লোকেরা যুদ্ধ

করে বলেই তো আমাদের মতো কত মানুষ মরে যায়, আবার হাসে শ্যামুয়েল, হাত-পাও কাটা যায়—

নটবর তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, মাথা খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আমাদের এখন। জিজ্ঞাসা করেন। কম ভুগেছি নাকি কুন্দন-লালের দোকান থেকে গলা-ধাক্কা খেয়ে—

সিরিল বলে, ঠিক কথা শ্যামুয়েল। রাগ একেবারেই নাই জটাধর আর নটবরের। মুখে হাসি লেগেই থাকে সব সময়।

জটাধর বলে, পরামর্শের জন্যে আসি আপনার কাছে। দু-চার টাকা বেশি না পেলে সংসার তো চালাতে পারি না আর—

শ্যামুয়েল জিজ্ঞেস করে, মাইনে বাড়বার কী হল মধু?

সুযোগ পেলেই তাগাদা দিই ভুবনবাবুকে। বলে, সাহেবের শরীর সারুক—মধু উপদেশ চায় শ্যামুয়েলের কাছে, কী করি বল তো শ্যামুয়েল?

শ্যামুয়েল ভাবে। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় না। সৎপরামর্শ দিতে গেলে অনেক ভেবে-চিন্তে কথা বলতে হয় বইকি। আবোল-তাবোল বুঝিয়ে যদি কাজ না হয়ে উলটো ফল হয় তখন এতগুলো মানুষের বিপদের জন্যে দায়ী হতে হবে শ্যামুয়েলকে।

লণ্ঠনের সলতে একটু বাড়িয়ে দিয়ে সে জোরে বলে, রেণু কাগজ-পেনসিল আন দেখি।

রেণু রান্নাঘর থেকে সাড়া দেয়, যাই।

নটবর বলে, এই যে কাগজ-পেনসিল। কী লিখে রাখবেন দাদা?

নিজের কাছে রাখব না, লিখতে লিখতে বলে শ্যামুয়েল, একটা দরখাস্ত লিখে দেব আপনাদের। সেটা দিয়ে দেবেন দাস সাহেবের হাতে—

মধু বাধা দিয়ে বলে, সাহেব নিজে নেবেন না কিছু। ভুবনবাবুর হাতে দিয়ে এখন সব পাঠাতে হয় তাঁর কাছে।

তাই না-হয় পাঠাবি, কাগজের ওপর পেনসিল ঠেকিয়ে মাথা তুলে শ্যামুয়েল বলে, মুখের কথায় চট করে কাজ হয় না রে মধু। লিখে দিলে কথার দাম বাড়ে। তোরা সকলে সই করে এই দরখাস্ত দিবি। কালি দিয়ে বড় কাগজে লিখে নিবি ভালো করে। আচ্ছা, আমিই না-হয় ফেয়ার করে দেব।

তাই দিস শমু। আমরা অত বুঝি না। কী লিখতে কী লিখে বসব শেষে।

আব্দুল বলে, আপনার মতো কে আর পারবে।

আমজাদ বলে, কথা শুনেই বুঝতে পারি যুদ্ধ করে কত জ্ঞান-গম্যি হয়েছে আপনার।

লেখা শেষ করে শ্যামুয়েল ওদের পড়ে শোনায়। ইংরেজিতেই লিখেছে সে। ওরা সকলেই মোটামুটি মানে বুঝতে পারে। তবুও শ্যামুয়েল বাংলা করে প্রথম থেকে শেষ অবধি দরখাস্তর মানে বুঝিয়ে দেয় ওদের।

শ্যামুয়েল দাস সাহেবের অফিসের নাম করেই লিখেছে—

মাননীয় মহাশয়,

আমরা—আপনার আপিসের কর্মচারিগণ—অতি দরিদ্র। আমাদের মাহিনায় আমরা কোনো রকমেই সংসার চালাইতে পারি না। দয়া করিয়া আমাদের মিনতি রাখিবেন। আমাদের মতো দুঃখী মানুষের অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া পঞ্চাশ টাকা মাহিনার ব্যবস্থা করিলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। অপরাধ নিবেন না। ক্রোধ করিবেন না। আমরা অতি দরিদ্র।

শ্যামুয়েল জিজ্ঞেস করে, কেমন হল?

নটবর বলে, বাঃ এই তো চাই।

আপনারা সকলে সই করে এটা দেবেন ভুবনবাবুর হাতে। যদি এতেও কিছু না হয় তাহলে কয়েকদিন পর আর-একটা চিঠি করে দেব।

কিন্তু ওই চিঠিতেই কাজ হয়। ভুবনবাবু নাকি চিঠি পড়ে ওদের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল অনেকক্ষণ। জিজ্ঞেস করেছিল, কে লিখে দিয়েছে চিঠিটা। শ্যামুয়েলের নাম করতে দ্বিধা হয় নি ওদের।

খোলা চিঠি হাতে নিয়ে নীরস মুখে তখুনি ভুবনবাবু যায় দাস সাহেবের কাছে। কী বলে কে জানে, কিন্তু মাইনে ওরা বেশি পেল বটে মাসের প্রথমে। পঞ্চাশ টাকা নয়—পঁয়ত্রিশ টাকা। মুখে বলেছেন দাস সাহেব, তিন মাস পর বাজার বুঝে আবার বাড়বে।

মাইনে পেয়ে শ্যামুয়েলের জন্যে এক বাক্স মিষ্টি নিয়ে এসেছিল সকলে মিলে। মুখে হাসি আর ধরে না। বাড়ুক তিন টাকা—কিন্তু কাজ হয়েছে তো শ্যামুয়েলের চিঠিতেই। কাজেই তাদের খুশির ভাগ সবচেয়ে আগে তাকেই দিতে চায় ওরা। সকলে হাসে। চিৎকার করে। বসন্তর কাছে এসে তাকে তাদের উল্লাসের কারণ জানায়।

বসন্ত চুপচাপ একদিকে বসে এদের কথা শোনে। কিছু বোঝে না। নিজে কারুর সঙ্গেই আর বেশি কথা বলতে চায় না। গালে হাত দিয়ে ঝিমোয়। জল গড়িয়ে পড়ে চোখ থেকে। শোকের আঘাত এতদিন পর অনুভব করে ভেঙে পড়ে। যেন এইমাত্র মৃত্যু হয়েছে সরলার।

কবরখানায় যেতে আর মন চায় না বসন্তর। সেখানে শুধু মাটি পাথর আর অন্ধকার। কী হবে সেখানে গিয়ে আপন মনে প্রলাপ বকে—কী হবে সেখানে শুধু শুধু কঠিন মাটিতে মাথা খুঁড়ে।

কবরখানার মালীর কাজ করতেও আর ইচ্ছে করে না তার! এখন মরতে পারলেই সে যেন বাঁচে।

মার্বল পাথরের একটা ছোট ক্রশ চায় বসন্ত। তার শোকের একটা চিহ্ন পুঁতে রাখতে চায় সরলার মাথার কাছে। যদিও সে আর নেই কবরের মধ্যে—মাটিতে মিশে গেছে। মিশে যাক! তাকে ভুলতে পারে নাকি সে! স্মরণের ছোট একটা ক্রশ তার মন আর মাটি—সরলা আর বসন্তর দূরত্বের সব ব্যবধান ঘুচিয়ে দিক।

অ্যালবার্ট বলে, এ আর এমন কথা কী দাদা। দু-তিন দিনের মধ্যেই বানিয়ে দেব।

দিবি? ঠিক? সাহেবকে বলি তাহলে?

আমিই বলব। তুমি শুধু শুধু কষ্ট করে আবার ছুটোছুটি করবে কেন।

কী লিখবি বল দেখি অ্যালবার্ট?

বলেন না? টুকে নিয়ে যাই সব?

নড়েচড়ে বসে বসন্ত। অনেকক্ষণ ধরে কী ভাবে। তারপর থেমে থেমে বলে, লিখব—ইন মেমোরি অব মাই বিলাভেড ওয়াইফ সরলাবালা নাথ—ডায়েড : থার্ড জুলাই নাইনটিন ফরটি টু—

অ্যালবার্ট বলে, আর জন্ম-সালটাও তো খোদাই করতে হবে দাদা—সেটা বলেন?

মাথা চুলকোয় বসন্ত। সরলার জন্ম-সালটা ঠিক মনে করতে পারে না। বিজলীকে ডাকে, বিজু, ও মা বিজু—

বিজলী এসে বলে, কী বলছ বাবা?

তোর মায়ের জন্ম-সালটা কত যেন রে?

বিজলী বুঝতে পারে না কেন এতদিন পর হঠাৎ বসন্ত এ-কথা জানতে চায়। কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়েও থাকে না। টেবিলের ওপর থেকে বাইবেলটা তুলে নিয়ে মলাট উলটে বলে, এই যে বাবা,

পাদ্রী সাহেবের হাতের লেখা—নভেম্বর মাসের চার তারিখ, উনিশ শো সাল—

হেঁ হেঁ, বসন্ত হেসে বলে, শুনলি অ্যালবার্ট ? নে, সব ভালো করে লিখে নে দেখি —

নটবর বসন্তকে এক টুকরো কাগজ আর একটা পেনসিল দেখিয়ে বলে, এই যে দাদা, আমি লিখে নিয়েছি। কাল আপিসে গিয়েই অ্যালবার্টকে দেব।

বসন্ত তাগিদ দিয়ে বলে, ঠিক দিও ভাই।

অ্যালবার্ট হাসে, তোমার কাজ—তাও দুবার বলতে হবে নাকি আমাদের।

দু-একদিনের মধ্যেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময় করে বসন্তর ক্রুশটা তৈরি করে ফেলে অ্যালবার্ট। নিখুঁত হয়েছে। হাতে নিয়ে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে নিজেই দেখে সেটা। সকলকে ডেকে দেখায়।

কিন্তু দাস সাহেবকে কিছু বলবার সুযোগ পায় নি অ্যালবার্ট। তিনি অফিসে আসছেন না কয়েকদিন থেকে। ভুবনবাবুকে বললেই চলত কিন্তু তাকে কোনো অনুরোধ জানাতে মন সায় দেয় না অ্যালবার্টের। তাই ক্রুশটা পড়েই থাকে ঘরে। বসন্তর হাতে তুলে দিতে পারে না সে।

আবার শীত এসেছে। রোদের তেজ তত প্রখর নয়। আস্তে আস্তে হেঁটে দাস সাহেবের অফিসের দিকেই যায় বসন্ত। কাজের জন্যে নয়। গায়ে জোর নেই। ও-কাজ আর করতে পারবে না সে। সরলার কথা মনে করেই বসন্ত যায় সেদিকে।

একেবারে বদলে গেছে দাস সাহেবের অফিস। পুরনো জায়গাটাকে চেনাই যায় না আর। অনেক বড় করা হয়েছে গেট। দুপাশে টুলের ওপর বসে আছে দুজন নেপালী দারোয়ান। খাকী

শার্ট। হাফপ্যান্ট। মাথায় টুপি। কোমরের বেল্টে ভুজালির বাঁকা খাপ ঝুলছে।

আগে এখানে কাজ না করলে আজ হয়তো বাইরে থেকেই ফিরে যেত বসন্ত। ভেতরে ঢোকবার সাহস হত না। ভুজালি দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেত। কিন্তু ভয় কী বসন্তর। তার ছেলেও তো এখানে কাজ করেছে বহুদিন। আর এখন যারা কাজ করছে তাদের সকলের সঙ্গেই তার খাতির।

বসন্ত এগিয়ে এসে গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ে। দারোয়ান দুটো তার ভঙ্গি দেখে বাধা দিতে সাহস পায় না। কফিনের অর্ডার দিতে এসেছে মনে করে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকে দেয়। আপন মনেই হাসে বসন্ত। ভাবে, তাকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছে ওরা।

কোথায় যাবে বসন্ত। সব নতুন হয়ে গেছে যে। কে-কোন ঘরে কাজ করে সে বুঝতে পারে না। অ্যালবার্টকে আগে থেকে একটু জানিয়ে রাখলে ভালো হত বোধ হয়। কিন্তু এখানে আসা তো ঠিক ছিল না তার। ক্রুশটার কথাই জানতে এসেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বসন্ত এদিক-ওদিক তাকায়। কাঠ কাটবার শব্দ আসে খর খর খর। পাথরের ওপর নাম খোদাই হয় টক টক টক। পেরেকের ওপর হাতুড়ির ঘা পড়ে ঠুম ঠুম ঠুম। সামনে দামী মার্বল পাথর পড়ে আছে অনেক। একটা নতুন ঘর যেন কাঠের গোলা। কত কাঠ তোলা হয়েছে সেখানে। হার্সের সংখ্যাও বেড়েছে অনেক। নতুন ড্রাইভারও রেখেছেন বোধ হয় দাস সাহেব।

আরে দাদা যে, আব্দুল প্রথমে দেখতে পায় বসন্তকে, আসেন আসেন, সে তাকে অ্যালবার্টের কাছে নিয়ে গিয়ে বলে, দাদা নিজেই এসে গেছে অ্যালবার্ট। ক্রুশটা তো তৈরী তোমার। দিয়ে দাও—

অ্যালবার্ট বসন্তকে দেখে অবাক হয়ে যায়, রোগা শরীরে হাঁটাহাঁটি কর কেন? আমি নিজেই তো নিয়ে যেতাম—

বসন্ত মাটিতে বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, ক্রুশটা সরলার মাথার কাছে বসিয়ে না দিলে শান্তি পাই না রে—ম্লান হেসে সে বলে, কোনদিন মরে যাই—তাই নিজেই চলে এলাম। বসন্ত অবাক হয়ে এপাশে ওপাশে তাকায়, কত বদলে গেছে সব। আমি তো কিছু চিনতেই পারি না। সাহেবের ঘর এখন কোনটা রে?

সাহেব আসেন নি আজ, অ্যালবার্ট ক্রুশটা তুলে দেয় বসন্তর হাতে, কেমন হল দাদা বলো?

দুই হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে বসন্ত অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে, বাঃ, সুন্দর হয়েছে রে! বেঁচে থাক অ্যালবার্ট।

বসন্তর স্বর শুনে খোপে খোপে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ওরা সকলে বেরিয়ে এসে অ্যালবার্টের খোপের দিকে উঁকি মারে। বসন্তকে দেখে। হাসে। কথা বলে।

ওরে দেখ তোরা, ক্রুশটা তুলে ধরে উঠে দাঁড়ায় বসন্ত, কেমন কাজের লোক হয়েছে অ্যালবার্ট? কী জিনিস বানিয়ে দিয়েছে দেখ সকলে—বসন্ত বেরিয়ে এসে ভালো করে দেখায় সকলকে।

কাজ থেমে গেছে। কোনো শব্দ না পেয়ে তাড়া দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ভুবনবাবু। জটলা দেখে তাকিয়ে থাকে। বুড়ো লোকটাকে দূর থেকে বুঝতে পারে না। আরও কাছে আসে।

কে ওখানে?

স্বর শুনে বসন্ত ঘুরে দাঁড়ায়। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। চেহারাই বদলে গেছে ভুবনবাবুর। খুব মোটা হয়েছে। একেবারে অন্য রকম জামা-কাপড় পরেছে! কোট প্যান্ট। গলায় টাই। কেমন রাগী-রাগী চেহারা। মুখের করুণ ভাবটা আর নেই।

বাবু, কিছুক্ষণ পর বসন্ত এগিয়ে এসে বলে, আমি বসন্ত।

দৃষ্টি কঠিন হয়ে ওঠে ভুবনবাবুর। চিনতেই পারে না বসন্তকে। যেন একটা অচেনা লোক না বলে-কয়ে হঠাৎ ঢুকে পড়েছে। ভুবনবাবু রূঢ় স্বরে জিজ্ঞেস করে, তোমার হাতে ওটা কী?

এই যে বাবু, বসন্ত ক্রশটা দেখায় ভুবনবাবুকে, অ্যালবার্ট বানিয়ে দিয়েছে, শ্যামুয়েলের মায়ের কবরে---

তার কথা শেষ না হবার আগেই ভুবনবাবু চিৎকার করে ডাকে, অ্যালবার্ট---অ্যালবার্ট—

অ্যালবার্ট বেরিয়ে আসে, কী বলেন?

কী ব্যাপার? ওটা কোথা থেকে হল? কার কাছ থেকে অর্ডার নিলে তুমি?

অ্যালবার্ট কথা বলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

জবাব দাও।

থেমে থেমে অ্যালবার্ট বলে, সাহেব আসেন নাই। তাই বলতে পারি নাই।

আমি কি কেউ নই নাকি? আমি ছিলাম না এখানে? গলার স্বর আরও অনেক তোলে ভুবনবাবু, তোমরা ভেবেছ কী? যা খুশি তাই করবে? রাস্তা থেকে লোক ধরে এনে কোম্পানির মাল বিলিয়ে দেবে?

ভুবনবাবুর রূঢ় স্বর শুনে খোপ থেকে বেরিয়ে এসেছে সকলেই। মধু আস্তে আস্তে বলে, যাক গে বাবু। পুরনো লোক। ছোট একটা ক্রশ—

সাহেব আমাকে ওঁর আপিসের ভার দিয়েছেন কি তোমাদের আব্দার মেটাবার জন্যে? কোম্পানির পাই-পয়সার হিসেব আমাকে রাখতে হয়—ভুবনবাবু চেঁচিয়ে ডাকেন, দারোয়ান!

দারোয়ান ছুটে এসে সেলাম করে বলে, হুজৌর?

যাকে-তাকে এভাবে ভেতরে আসতে দাও কেন? বসন্ত, এ-ভাবে আর এখানে এসো না তুমি। সাহেবের হুকুম নেই। অ্যালবার্ট, ক্রুশটা নিয়ে তুলে রাখ—ভুবনবাবু নোটবুক বের করে কী লিখে যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

প্রথমে বসন্ত বুঝতে পারে না যে তারই হাতের ক্রুশ লক্ষ করে কথা বলছে ভুবনবাবু। এদিক-ওদিক তাকায়। প্রত্যেকের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কোনো কথা বলছে না কেউ।

কী হল? রুক্ষ স্বরে আবাব কথা বলে ভুবনবাবু, কাজ বন্ধ করে মজা দেখতে এসেছ নাকি সব? নিজেদের বেলায় শুধু মাইনে বাড়াবার দরখাস্ত করবে আর কাজের বেলায়—

বাধা দিয়ে অ্যালবার্ট বলে, আমি দাদার কাছ থেকে ক্রুশ ফিরিয়ে নিতে পারব না বাবু!

দাবোয়ান, ভুবনবাবু চেঁচায়, ওটা নিয়ে রেখে দাও। পরে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে অ্যালবার্ট।

নেপালী দারোয়ান বসন্তর সামনে গটগট করে এগিয়ে এসে হাত বাড়ায়, দিজিয়ে।

কী দেব? বসন্তর গলার স্বর কেঁপে ওঠে। মাথাটা ঘুরতে শুরু করছে হঠাৎ। ক্লান্তিতে পা টলছে। সে অসহায় মানুষের মতো দারোয়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

ভুবনবাবু ধমকের সুরে কথা বলে, ও ক্রুশটা এখান থেকে তুমি নিয়ে যেতে পার না বসন্ত। আমাকে না বলে অ্যালবার্ট ওটা তৈরি করেছে। কে দাম দেবে? খাতায় কী লিখব আমি?

বসন্ত এতক্ষণে বোধহয় সব বুঝতে পারে। বিবর্ণ মুখে সে পিছিয়ে আসে। ঠোঁট কাঁপে তার। শক্ত করে বুকে ক্রুশ চেপে ধরে বলে, আমি দাম দেব বাবু। আস্তে আস্তে সব চুকিয়ে দেব। কত দেব বাবু?

সে যখন দেবে তখন হবে। আমি সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দেখব আগে। এখন বাজে কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না। ওটা দিয়ে দাও, ভুবনবাবু আর-একবার হাঁক দেন, দারোয়ান--

কিন্তু কিছুতেই ক্রশ ফিরিয়ে দেবে না বসন্ত। এই ছোট ক্রশের গায়ে সরলার সুবাস লেগে আছে --এটা তার মাথার পাশে রাখতে না পারলে সে বেঁচে থাকবে কেমন করে।

বাবু? দীন নয়ন বসন্তর। করুণ মিনতি স্বরে। আরও জোরে ক্রশ বুকে চেপে ধরেছে বসন্ত। সে যেন প্রত্যেকের কাছে সাহায্য চাইছে তার হয়ে ভুবনবাবুকে অনুরোধ করবার জন্যে। অ্যালবার্ট, মধু, বেন, জোসেফ, নটবর, জটাধর, আব্দুল, আমজাদ আর সব কর্মচারী দাঁড়িয়ে আছে তাকে ঘিরে। তাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে চোখ তুলে বসন্ত তাকায়।

ওরে তোরা বল একবার?

কী বলবে? বিরক্তিতে ভুবনবাবুর চেহারা অন্য রকম দেখায়, এটা ছেলেখেলা করবার জায়গা নয় বসন্ত। কেন এক কথা বার বার বলিয়ে তুমি আমার সময় নষ্ট করছ?

যদিও কড়া স্বরে একটু আগে সকলকে কাজে ফিরে যেতে বলেছে ভুবনবাবু কিন্তু কেউ নড়ে না সেখান থেকে। গ্রাহ্য করে না ভুবনবাবুর কথা। উষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা কিছু করবার বাসনা দুর্বার হয়ে ওঠে, কিন্তু হঠাৎ ঠিক করতে পারে না কী করা উচিত এখন।

কেন কথা শোন না দারোয়ান? চিৎকার করে ওঠে ভুবনবাবু, কেড়ে নাও!

আমি দেব না—আমি দেব না—বাবু—দারোয়ান ক্রশ স্পর্শ করতেই বসন্ত বসে পড়ে। দ্রুত শ্বাস পড়ে তার। কপালে অল্প

অল্প ঘাম জমে ওঠে। আস্তে আস্তে ক্রুশটা টানতে থাকে দারোয়ান।

বাড়াবাড়ি করবেন না বাবু, বেশ কঠিন স্বরেই বলে নটবর, আমরা চাঁদা করে দাম দেব—এই দারোয়ান ছোড় দেও—

আমজাদ বলে, ইস্, দেখেছ—

ক্রুশ বুকে চেপে ধরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে বসন্ত। যেন এইবার তার কাছ থেকে সেটা কেড়ে নিতে পারবে না কেউ। কোটের হাতায় ময়লা লেগেছে। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে বসন্তর। জোর করতে ভরসা পাচ্ছে না নেপালী দারোয়ান। খুব আস্তে ক্রুশটা ধরে আছে শুধু।

দারোয়ান, ভুবনবাবু ডাকে।

খবরদার, এরা চেঁচিয়ে ওঠে, আমরা সাহেবকে ডেকে আনব তারপর ব্যবস্থা হবে—

ভুবনবাবু কী বলতে যায়। এরা শোনে না তার কথা। অ্যালবার্ট ছুটে বেরিয়ে যায় দাস সাহেবকে এখুনি ডেকে আনতে।

ওদিকে বসন্তর মুখ থেকে ফেনা ওঠে। মাথা তুলে করুণ চোখে সে তাকায় সকলের দিকে। মাথাটা ঢলে পড়ে তার। ক্রুশটা বুকেই লেগে আছে যেমনকার তেমন।

মধু তাড়াতাড়ি বসন্তর নাকে হাত দিয়ে চমকে ওঠে, নিশ্বাস পড়ে না যে নটবর—

সে কী!

দারোয়ান সরে যায়। এরা ঝুঁকে পড়ে বসন্তর দেহের ওপর। সব শেষ হয়ে গেছে। শ্যামুয়েলের বাপ এসে তাদের চোখের সামনে মরল অথচ কিছুই করতে পারল না তারা। কী কৈফিয়ত দেবে ওরা এখন শ্যামুয়েলকে।

জটাধর বলে, কী বলবি মধু? এ যে শ্যামুয়েলের বাপ?

রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করে ওঠে আব্দুল, এতগুলো লোক মিলে শ্যামুয়েলের বাপকে বাঁচাতে পারলাম না—বেইমান বাবুটাকে ঠেকাতে পারলাম না—পিছন ফিরে আব্দুল দেখে ভুবনবাবু কোথাও নেই। গেটটা খোলাই রেখে গিয়েছিল অ্যালবার্ট—কখন ভুবনবাবুও বেরিয়ে গেছে বুঝতে পারে নি কেউ!

প্রাণহীন বসন্তর মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকে মধু! তার বুক চিরে শুধু একটি আকুল আকুতি ঠেলে ওঠে, প্রাণ দাও—প্রাণ দাও!

কেমন করে এ-মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাবে সে বিজলীর সামনে।

আকাশ মেঘলা হয়ে গেছে হঠাৎ। ম্লান। ফ্যাকাশে। রোদ নেই। কনকনে হাওয়া বইছে। বোধ হয় ঝিরঝির বৃষ্টি নামবে। মাথার ওপর একটা কাক এক সুরে ডেকে চলেছে—কা কা কা! শার্টের হাতা দিয়ে চোখ মোছে মধু। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বসন্তর ব্যথা-জর্জর ঠাণ্ডা মুখের দিকে। আবার চোখে জল জমে ওঠে তার।

দাস সাহেবের বড় গাড়ি দাঁড়ায় গেটের সামনে। লাফিয়ে নেমে অ্যালবার্ট ছুটে আসে ভেতরে। তাড়াতাড়ি দাস সাহেবও আসেন তার পিছনে পিছনে। কিন্তু আজ লৌকিকতার কোনো বালাই নেই। এরা ত্রস্ত হয়ে ওঠে না তাঁর আগমনে। চোখের অদ্ভুত দৃষ্টিতে শুধু নীরব নালিশ জানাতে চায়।

এ কী! টুপি খুলে জর্জ মহেন্দ্রলাল দাস ঝুঁকে পড়ে বসন্তর দেহের ওপর। গায়ে হাত দেন। চমকে পিছিয়ে আসেন। হতাশ দৃষ্টিতে তাকান প্রত্যেকের মুখের দিকে।

সাহেব! আর্তস্বরে বলে ওঠে অ্যালবার্ট, একটা ছোট ক্রুশ চেয়েছিল—আমি বানিয়ে দিয়েছিলাম। ওই যে—ওটা ভুবনবাবু কেড়ে নিতে গিয়েছিল বলেই দাদা বুঝি—

পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করে চোখে বুলিয়ে ভারী

থেমে থেমে দাস সাহেব বলেন, তোমরা ক্রুশটা বাড়িতে দিয়ে আসতে পারলে না? ছি ছি, এতদূর হেঁটে এসেই বোধহয় বেচারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল—

কে একজন বলে উঠল, ভুবনবাবু ওটা দিয়ে দিলেই দাদা বাঁচত সাহেব।

দাস সাহেব ম্লান হাসলেন, তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন বসন্ত এমনি করে শেষ হয়ে যাবে? টেলিফোনে আমাকে সব কথা বলেছেন ভুবনবাবু। ছি ছি, সামান্য ব্যাপার থেকে কী হয়ে গেল! চলো, আমরা সকলে মিলে মৃতদেহ নিয়ে যাই শ্যামুয়েলের কাছে, আবার চোখ মুছলেন দাস সাহেব, আমারই এখানে এসে শেষ হয়ে গেল! কাজের লোক ছিল বসন্ত। অমন সৎলোক আমি খুব কম দেখেছি। ঈশ্বর তাঁর আত্মার মঙ্গল করুন!

নিজের গায়ের কোট খুলে দারোয়ানের হাতে দিলেন দাস সাহেব। শার্টের হাতা গুটিয়ে নিলেন। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বসন্তর মুখের দিকে। তারপর নিচু হয়ে দুই হাত তার কাঁধের তলায় দিয়ে ডাকলেন, এসো সকলে মিলে ধরাধরি করে আমার গাড়িতে তোলো!

গাড়িতে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বড় করুণ দেখায় জর্জ মহেন্দ্রলাল দাসের মুখ, আমার মোটর গাড়িতেই বসন্তকে বাড়ি নিয়ে যাব। এসো সকলে---

দাস সাহেব নিজে মৃতদেহ তুলতে যাচ্ছেন—এ দৃশ্য ওদের কাছে অভাবনীয়। ওরা সকলে তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে বসন্তর দেহের ওপর, আমরাই নিয়ে যাচ্ছি সাহেব—আপনি কষ্ট করবেন না।

দাস সাহেব হেসে বলেন, আমার কষ্ট হবে না অ্যালবার্ট,

কষ্ট কমে যাবে—তিনি ক্রুশটা বসন্তর বুকের ওপর ঠিক করে রাখেন নিজেই।

দারোয়ান নির্দেশ পেয়ে মোটর গাড়ির দরজা খুলে দেয়। তখন সাবধানে সেখানে রাখা হয় বসন্তর দেহ। দাস সাহেব নিজেই গাড়ি চালাবেন।

এদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, খুব আস্তে আস্তে চালাব আমি। তোমরা সকলে পিছনে পিছনে হেঁটেই চলো, নিশ্বাস ছাড়েন দাস সাহেব, বড় দুঃখ পাবে শ্যামুয়েল, সকলে মিলে তাকে সান্ত্বনা দিতে হবে—

খুব আস্তে আস্তে মোটর গাড়ি চলতে থাকে। শুধু নেপালী দরোয়ান চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে গেটের কাছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মন্থরগতি মোটর গাড়ির দিকে। অফিসের যত লোক চলেছে পিছনে পিছনে পায়ে হেঁটে। মুখে আর কথা নেই কারুর। ছলো-ছলো চোখ। বিষণ্ণ মুখ। যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে পা ফেলে আস্তে আস্তে চলেছে দাস সাহেবের নির্দেশমতো।

বড় রাস্তায় পড়তেই কবরখানা দেখা গেল। সে তো আসতে যেতে রোজই দুবেলা দেখে ওরা। দেখেও দেখে না। আজও মাথা নিচু করে চলতে চলতে লক্ষই করল না। বসন্তর যত স্মৃতি একে একে মনে পড়ছে সকলের।

মধু কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কবরখানার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। চোখ ফিরিয়ে দাস সাহেবের মোটর গড়িটাকে দেখে। হার্সের মতোই মনে হয়। মধুর পা চলে না। যেতে মন ওঠে না দাস সাহেবের পিছন পিছন। বিপরীত মুখে ছুটে যেতে ইচ্ছা করে। তবু আস্তে আস্তে চলতে হয় দাস সাহেবের গাড়ির সঙ্গে তাল রেখে কবরখানার দিকে। বসন্তর মতোই।

দরজা খোলাই ছিল। মোটা একটা খাতায় হিসেব লিখছিল

শ্যামুয়েল। এদেরই টাকা-পয়সা জমার হিসেব। বিজলী তাকে সাহায্য করছিল ঠিকমতো অঙ্ক মেলাতে। বরাবরই অঙ্কে একটু বেশি মাথা বিজলীর।

রেণু সবে উনুন ধরিয়েছে। ধোঁয়া আসছে ঘরে। এত তাড়াতাড়ি যদিও উনুন ধরাবার কোনো দরকার নেই কিন্তু রেণু জানে এই সময় এক কাপ গরম চা পেলে খুশী হয় শ্যামুয়েল।

কোনো শব্দ করে না দাস সাহেবের মোটর গাড়ি। নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় বসন্তর বাড়ির সামনে। শ্যামুয়েল মাথা তুলে অবাক হয়ে যায়। দাস সাহেব এগিয়ে আসছেন তারই দিকে। খুব গম্ভীর মুখ। বোধহয় শ্যামুয়েল তাঁর কর্মচারীদের পক্ষ নেয় বলে অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

শ্যামুয়েল উঠে দাঁড়াবার আগেই দাস সাহেব ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েন। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। দাস সাহেবের কোটে পাতলা ফোঁটা পড়েছে কয়েকটা। তিনি শ্যামুয়েলের হাত দুটো ধরে চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ।

বাইরে আরও অনেককে এবার দেখতে পায় শ্যামুয়েল। নিরানন্দ মুখ তাদের। ঘরে আসে না। অপরাধীর মতো তাকায় শ্যামুয়েলের দিকে। চোখে চোখ পড়তেই মাথা নামায়। রেণুর উনুনের ধোঁয়ায় কিনা শ্যামুয়েল ঠিক বুঝতে পারে না, দাস সাহেব দু-একবার রুমাল চেপে ধরেন চোখে।

বুক বাঁধো শ্যামুয়েল, দাস সাহেব কথা বলেন, বসন্ত ফাঁকি দিয়েছে—

সাহেব?

আমার অফিসে গিয়েছিল একটা ক্রুশ আনতে—আমাকে বললে আমি বাড়িতে সেটা পাঠিয়ে দিতাম। দুর্বল শরীর, অত হাঁটাহাঁটি সহ্য হয় নি—

ঠোঁট দুটো কাঁপে শ্যামুয়েলের। দাস সাহেবের কথা বুঝতে পারে না। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাঁর মুখের দিকে। বাইরের লোকগুলোর নীরব ভাষা বোধহয় এতক্ষণ পর বুঝতে পারে।

কিন্তু বসন্ত কোথায়?

চলে যেতে গিয়ে দাস সাহেবের কথা শুনে বিজলী থমকে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে বাইরে তাকায়। মাথাটা ঝিমঝিম করে। দেহ অবশ হয়ে আসে। কাকে যেন খোঁজে এপাশে ওপাশে তাকিয়ে।

বাবা কোথায়?

দাস সাহেব বলেন, আমি তাকে নিয়ে এসেছি। কথা শোনো শ্যামুয়েল, আমার অফিসের পুরনো লোক বসন্ত। তার বেরিয়েলের সব ভার আমার। আমি জমি কিনব—আমি সব চেয়ে ভালো কফিন বানিয়ে দেব। শুধু তোমরা ভেঙে পড় না—তোমরা শক্ত হও—

যেমন ভাবে বসন্তর দেহ গাড়িতে তুলেছিলেন দাস সাহেব তেমনি ভাবেই ওদের সঙ্গে ধরাধরি করে আবার নামাতে যান। শ্যামুয়েল বেরিয়ে আসে! বাধা দেয়। কিন্তু কোনো বাধা মানেন না দাস সাহেব। তাঁকে দেখে অবাক হয়ে যায় শ্যামুয়েল।

রেণু কিছু জানতে পারে নি এখনও। ভালো করে উনুন না ধরতেই চায়ের কেটলি বসিয়ে দিয়েছে। রান্নাঘরে থাকতে বুঝতে পারে নি, বাইরে বেরিয়ে দেখে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু অত লোক কেন ওখানে। চোখ কচলে রেণু ভালো করে তাকায়। শ্যামুয়েলও গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কে এল আবার।

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়ালেই বুকটা হিম হয়ে যায় রেণুর। অগস্ট আন্দোলনে মাথা ফাটিয়ে শ্যামুয়েল বাড়ি

ফিরেছিল গাড়ি করে। আর রাতের অন্ধকারে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে যখন প্রথম আসে যুদ্ধের কাজ শেষ করে তখনও বাইরে দাঁড়িয়েছিল একটা বড় গাড়ি।

গাড়ি চড়ে কে এসেছে বিজু---

কথা শেষ হয় না রেণুর। ধরাধরি করে কাকে নিয়ে আসছে ওরা। বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়। কোনো গোলমাল নেই শহরে। বোমাও পড়ে নি তো আজ। তাহলে কার আঘাত লাগল। কৌতূহল দমন করতে না পেরে ঘোমটা টেনে সে রাস্তায় নামে। স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ায়।

সব লজ্জা ভুলে রেণু চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, বাবা!

তাকে সান্ত্বনা দেবার কথা মনে হয় না কারুর। দরজা ছেড়ে বিজলী সরে দাঁড়ায়। জানলার শিক ধরে থাকে শক্ত করে। দেহের সব রক্ত যেন মুখে এসে জমা হয়েছে। কথা বলে না কেউ। বসন্তর দেহ সাবধানে নামিয়ে দেয় তক্তাপোশের ওপর।

মাথার ঘোমটা কখন খসে গেছে রেণুর। চুল আলুথালু হয়ে পড়েছে। কয়লা আর হলুদের দাগ লেগেছে শাড়িতে। বসন্তর বুকের ওপর মুখ গুঁজে ফোঁপাচ্ছে সে।

ও বাবা কী হল। ও বাবা, কথা বলো। ওঠো বাবা, ওঠ। হায় হায়, হে ঈশ্বর --

শ্যামুয়েল মৃদুস্বরে বলে, বিজু ওকে দেখ।

বিজলী দেখে না। নড়ে না। কথা শোনে না শ্যামুয়েলের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নতুন চোখ দিয়ে মৃত্যুকেই দেখে। আপন মনে। শোকে আচ্ছন্ন কত লোক! দুঃখে মর্মাহত দাস সাহেব। নিবিড় শোকে কেমন এক অদ্ভুত সূক্ষ্ম অনুভূতি জাগে বিজলীর মনে। মৃত্যুর অলৌকিক ক্ষমতায় জীবনটা অন্যরকম মনে হয়। •

মা চলে গিয়ে সংসারের ভার দিয়ে গেল বিজলীকে। বসন্তকে

তুলে দিল তার হাতে। বয়সটা অনেক বাড়িয়ে দিল তার রাতারাতি।

আর ললিত? আরও কত বড় করে দিয়ে গেল তাকে। ছোট ঘরের স্বপ্ন ভেঙে ঠেলে দিল বিরাট বিশ্বে। এক-একটা মানুষ মরে আর একটু একটু করে বাঁচিয়ে দিয়ে যায় বিজলীকে। মনে মনে অনেক বড় হয়ে যায় সে।

মধুর মুখ ম্লান। অ্যালবার্ট কাঁদছে। শূন্য দৃষ্টি নটবর জটাধর আব্দুল আর আমজাদের। চোখ মুছছে বেন জোসেফ জেমস আর সকলে। যেন শুধু বিজলীর বাপ নয় বসন্ত—এদেরও বড় আপনার লোক।

তবে শোকের আঘাত অনুভব করুক এরা বুক দিয়ে। বড় হোক। বাঁচুক। একের মৃত্যু দায়িত্বের ভার দিয়ে যাক এদেরও হাজার প্রাণের।

রেণু কাঁদছে। শ্যামুয়েল বিমূঢ়। দাস সাহেব কী যেন বলে যাচ্ছেন তাকে খুব আস্তে আস্তে। কিছু শুনতে পায় না বিজলী। কাঁদেও না। তক্তাপোশের ওপর বসে বাপের কপালে হাত রাখে। রেণুকে জড়িয়ে ধরে। সারা দেহ কাঁপতে শুরু করে তার।

বাইরে জোরে জল নামে।

॥ বারো ॥

শ্যামুয়েল জানত না মাত্র একটি জন্ম লক্ষ মৃত্যুর ব্যথা ভুলিয়ে দেয়। যুদ্ধে দুর্ভিক্ষে মরেছে অসংখ্য লোক কিন্তু তাদের স্থান শূন্য নেই—ঘরে ঘরে নিত্য নতুন জন্ম যত শোক ধুয়ে মুছে আনন্দ পরিবেশন করেছে।

একটা ছেলে হয়েছে রেণুর। ফুটফুটে। বড় বড় চোখ। অভাবের সংসারে এসেও হাসে সারাদিন। হাসি ফোটায় সকলের মুখে। শিশুকে নিয়ে মেতে উঠে ওরাও যেন শিশুর মতোই হয়ে গেছে! তার ভাষা নকল করে কথা বলে। কোলে নিয়ে ঘোরে। পাঁচজনকে দেখায়।

নটবর ধরে বসে, খাওয়াতে হবে ভাই।

আমজাদ বলে, এমন চাঁন্দের মতো বেটা আপনার।

মধু জিজ্ঞেস করে, নাম কী রাখবি রে শ্যামুয়েল?

সবুর কর দুদিন, শ্যামুয়েল হেসে বলে, বেটা বড় হোক একটু।

জটাধর বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নেয়, বাপের নাম রেখো বাবা। হ্যাঁ তা রাখবে—তাগদ আছে ছেলের।

কিন্তু ছেলেটা বোধ হয় বিজলীকেই ভালোবাসে সবচেয়ে বেশি। তুলতুলে ঠোঁটটা অনেক ফাঁক হয়ে যায় তার দিকে তাকালে। বিজলী কোলে তুলে নিলেই চোখ বুজে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয়!

রেণু বলে, পিসিকে চিনেছে ঠিক।

ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরে বিজলী, একে আমায় দিয়ে দাও রেণু, আমিই মানুষ করব।

বেশ তো নাও না। ওর জ্বালায় পাগল হয়ে যাই আমি। শান্তি দেয় না একটুও---

কথা শেষ না করে বাচ্চাকে আদর করে রেণু। শান্তিও যেন পায়। বিজলী হাসে তার রকম দেখে।

বিজলীর দুই হাতে তাজা একটা প্রাণ দোলে—পবিত্র আত্মায় উজ্জ্বল জীবন! ছোট্ট মানুষটাকে আলগোছে সারাদিন দোলায় বিজলী। গান গায়। আর মনে মনে নিজেও দোলে। প্রাণের দোল-দোলানি গান কত মধুর! এই প্রাণকে বুক নিঙড়ে বাঁচিয়ে রাখবে—রুক্ষ মাটিতে ঝরে পড়া ফুলের মতো এই জীবনকে সাজিয়ে তুলবে বিজলী প্রাণের গান গেয়েই।

প্রাণ হাসে। প্রাণ কাঁদে। প্রাণ ছটফট করে। বিজলীর প্রাণ। সংসারের প্রাণ। পৃথিবীর প্রাণ। দুই হাতের মধ্যে গোটা পৃথিবীটাকেই যেন পায় বিজলী। প্রাণের সন্ধানে তখন আর বাইরে ছুটোছুটি করতে ইচ্ছে করে না তার। এই ঘর দুটোই যেন পৃথিবী হয়ে ওঠে। প্রাণ দিয়ে প্রাণকে ডাকে সারা দিন রাত।

ছোট্ট মানুষটা চেঁচায়।

কানের পুরনো হালকা দুল দুটো খুলে হাতের মুঠোয় নেয় রেণু। এদিক-ওদিক তাকায়। বিজলী ছেলেটাকে নিয়ে ব্যস্ত। রেণুর দিকে লক্ষ নেই এখন। সেই সুযোগে সে এসে দাঁড়ায় শ্যামুয়েলের পাশে।

ওগো এই নাও। যাও না একবার ওই দোকানে। এ দুটো বিক্রি করে কিছু টাকা এনে দাও দেখি আমায়—

রেণুর কথা বুঝতে পারে না শ্যামুয়েল, কী?

বা রে, সহজ স্বরে রেণু স্বামীকে মনে করিয়ে দেয়, আমজাদ নটবর মধু—ওদের খাওয়াতে হবে না বুঝি? খাবার কথা সেদিন বলে গেল না ওরা সকলে?

কথাটা মনে পড়তেই জোরে হেসে ওঠে শ্যামুয়েল, আরে দূর, ঠাট্টা করে বলেছিল ওরা। আমাদের অবস্থার কথা জানে না ভাব?

তা জানুক। আমার মন চায় ওদের খাওয়াতে—

তা বলে দুল বিক্রি করতে হবে? ওই তো এক কুচি সোনা আছে মোটে বাড়িতে। তা বিক্রি করে ওদের খাইয়েছি শুনলে ওরা দুঃখ পাবে রেণু।

কিন্তু রেণু শ্যামুয়েলের কথা বোঝে না। শোনে না। বলে, অত কথা ওদের জানাবার দরকারই বা কী। ওদের খাইয়ে রেণুর সুখ। তার আনন্দ। ওদের ওপর ভর করতে পেরেছে বলেই তো পা হারানোর দুঃখ ভুলেছে শ্যামুয়েল। ওরা আছে বলেই না স্বামীকে নতুন করে পেয়েছে রেণু। যারা তার স্বামীকে এত খাতির করে তাদের দাম দুটো সোনার দুলের চেয়ে রেণুর কাছে অনেক বেশি। শ্যামুয়েলের হাতে দুল দুটো গুঁজে দিয়ে তাকে এক রকম ঠেলে ঘরের বার করে দেয় রেণু।

মন্দ কথা বলে নি সে! আস্তে চলতে চলতে শ্যামুয়েল ভাবে। হাতের মুঠোয় সোনার কুচি দুটো হঠাৎ ধুলোর মতোই মনে হয় তার। রেণুর তো মনে হয়েছে আগেই। রেণুর দামটাও শ্যামুয়েলের কাছে বেড়ে যায় অনেক। হাসি মুখেই সে এসে অনন্ত কর্মকারের দোকানে দাঁড়ায়।

ছোট একটা নিক্তিতে হরেকরকম ওজন চাপিয়ে বার বার নিকেলের চশমাটা ঠিক করে বাঁকা চোখে তাকায় অনন্ত স্যাকরা। ওইটুকু জিনিস দুটো ওজন করতে সময় নেয় অনেক। আপন মনেই বিড়বিড় করে বলে, পাঁচ আনা সোনা। ঘষাঘষি করে দাম দিতে চায় পুরো তিরিশ টাকা।

হাত পেতে তাই নেয় শ্যামুয়েল। হাসে। কথা বলে না। সেখান থেকে পা বাড়ায় সোজা বাড়ির দিকে।

সন্ধ্যের আগে-আগেই ওরা আসে। তা প্রায় ষোলো-সতেরো জন হবে। সকলেই হাতে করে কিছু না কিছু এনেছে শ্যামুয়েলের ছেলের জন্যে। কাপড় টুপি পাউডার কিংবা চামচ বাটি ঝিনুক। ছেলেটা মাটিতেই পড়ে আছে মাদুরের ওপর। এত লোক দেখে বোধহয় উল্লাসে জোরে জোরে পা ছোঁড়ে।

ওর মাথার কাছেই ওরা জিনিস সাজিয়ে রাখে একে একে। মধু ওর ছোট হাতে চামচটা জোর করে ধরিয়ে দেয়। ছেলে ধরে না কিন্তু। চামচ ছুঁড়ে দিয়ে মধুর জামা চেপে ধরে গায়ের জোরে। মুখ দিয়ে উল্লাসের শব্দ বের করে ঠোঁট টান করে হাসে।

এসব আনবার কী দরকার ছিল? ভদ্রতা করে বলে শ্যামুয়েল, এখনও তো নামই ঠিক হয় নি ওর—

না হোক, মধু বলে, হবে তো বটেই। আমরা না-হয় আগেই খেয়ে গেলাম তোর বেটার খাতিরে।

আপনি কত ভাবনা করেন আমাদের জন্যে, আব্দুল বলে, আপনার বেটা তো আমাদেরই ঘরের ছেলে—

বাধা দিয়ে আমজাদ উল্লাসে চিৎকার করে, জান দিয়ে আপনার বেটাকে বড় করব আমরা। কী বলিস রে বেটা—অ্যাঁ?

বেটা তখন হাত-পা ছুঁড়ে সায় দেয় আমজাদের কথায়।

বেশ গরম পড়েছে কয়েকদিন থেকে। সন্ধ্যে বেলা একটু ঠাণ্ডা হয়। ঝিরঝির হাওয়া বয়। বিজলী আর রেণু দুজনেই রান্না-ঘরে। একটা লণ্ঠনে আজ কাজ হবে না বলে একটু আগে রেণু এসে এ ঘরের লণ্ঠনটাও নিয়ে গেছে।

অন্ধকারে ঘরে বসে না থেকে ওরা বাইরে এসে বসে।

ছেলেটা কোলে-কোলেই ঘোরে। গল্প জমায় সকলে মিলে। কথায় কথায় দাস সাহেবের কথাও উঠে পড়ে।

কথা রেখেছেন সত্যি দাস সাহেব। দামী কাঠের কফিন তৈরি করে দিয়েছেন বসন্তর জন্যে। ভালো মার্বল পাথরে সুন্দর করে বাঁধিয়েও দিয়েছেন কবরটা। বড় বড় দুটো ক্রশ বসিয়ে দিয়েছেন বসন্ত আর সরলার কবরের ওপর।

কিন্তু ভুবনবাবুকে কোথায় সরিয়ে দিয়েছেন কেউ জানে না। এদের কারুর তার কথা আর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছেও করে না দাস সাহেবকে। যাক লোকটা যেখানে খুশি। তবে শোনা যায় ভুবনবাবু নাকি এ কাজ ছেড়ে হালুয়াঘাট মিশনে অন্য আর একটা কাজ নিয়ে চলে গেছে।

ভালোই হয়েছে। এরা কিছুতেই তার সঙ্গে আর কাজ করতে পারত না এই অফিসে। নিজের থেকে সরে না গেলে জোর করে তাকে সরিয়ে দিত এখান থেকে। সব সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে বলে শ্যামুয়েল। তাই মাথা গরম করে ঝোঁকের মাথায় বসন্তর মৃত্যুর দিনে এরা কিছু করতে পারে নি।

ভুবনবাবুর বদলে নতুন একজন ম্যানেজার এসেছে এখন দাস সাহেবের অফিসে। বাঙালী নয়, সাদা চামড়ার সাহেব। লোকটা ভালোই। সব সময় হাসি মুখে কথা বলে এদের সঙ্গে। সব ভার তার ওপর এখনও দেন নি দাস সাহেব। নিজে সব সময় তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরেন। কিছু না বলতে নিজের থেকেই মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন এদের। এখন এরা পঞ্চান্ন টাকা করে মাসে মাসে পায়। যদি বেশি কফিনের অর্ডার থাকে আর রাতারাতি তা বানিয়ে ফেলতে হয় তাহলে এরা ছুটির পর ঘণ্টা হিসেবে আরও বেশি টাকা পায়।

মধুই প্রস্তাব করে, এতদিন বলি নাই শমু, এবার বলি, ছেলেটাকে জোসেফের কোলে তুলে দিয়ে মধু বলে, তোর

একটা কাজ মুখ ফুটে দাস সাহেবকে বললেই কিন্তু হয়ে যায়—

শ্যামুয়েল হেসে বলে, আমি কি আর তোদের মতো ভালো কাজ করতে পারব রে এখন ?

কেন পারবেন না? আব্দুল বলে ওঠে, আপনি আমাদের কাছে কাছে সব সময় থাকলে কত সুবিধা হবে আমাদের।

জটাধর বলে, ঠিক কথাই বলেছে মধু।

শ্যামুয়েল নিজে যে ছেলেটার ভবিষ্যতের কথা এতদিন চিন্তা করে নি তা নয়। একটা কাজ যোগাড় করে নেয়ার কথাও তার অনেকবার মনে হয়েছে। এখন থেকেই চোখ কান খোলা রেখে ব্যবস্থা পাকা করে তুলতে হবে---যেন ছেলেটাকে টাকা রোজগার করবার জন্যে কোনোদিনও মারামারি কাটাকাটির মধ্যে যেতে না হয়—যুদ্ধের জাঁকজমক দেখে শ্যামুয়েলের মতো তারও মাথাটা না খারাপ হয়ে যায়।

কথাটা তাকে প্রথম বুঝিয়ে দিয়েছিল চক্রবর্তী। তার কথা প্রায়ই মনে পড়ে শ্যামুয়েলের। ছেলে কোলে নিয়ে বউ আর বোনের সুখের সংসারে বসে থাকতে থাকতে শোকের ঠাণ্ডা একটা ঢেউ এসে গায়ে লাগে হঠাৎ। তখন যুদ্ধক্ষেত্রের সেই ভয়ঙ্কর দিনটা তাকে বার বার পীড়া দেয়। চক্রবর্তী এসে দাঁড়ায় চোখের সামনে।

লোকটাকে প্রথম দিন দেখে মোটেই ভালো লাগে নি শ্যামুয়েলের। কেমন ভয়-ভয় ভাব। কান্না-কান্না মুখ। ঝকমকে পোশাক-আশাক পরেও জৌলুস খোলে নি চেহারার। চলতে চায় না। জোর করে চালাতে হয়। কথায় কথায় তাড়া খায় সুবেদারের। নির্বিকার। যেন জয়-পরাজয়ে কিছুই এসে যায় না তার। সময় পেলে চিঠি লেখে। আর সারাদিন খোঁজ করে তার নামে কোনো চিঠি এল কিনা। কাকে চিঠি

লেখে কে জানে—কার চিঠির আশায় বসে থাকে কেউ খবর রাখে না।

শ্যামুয়েল কৃপার দৃষ্টিতেই চক্রবর্তীর দিকে তাকিয়ে বলত, কী ভাবেন অত মুখ ভার করে? যুদ্ধ করতে এসে অমন মিইয়ে গেলে চলে?

কী করতে হবে বলতে পারেন? স্বরটা রুক্ষ শোনাত চক্রবর্তীর।

করবেন আবার কী? তাকে বিদ্রূপ করত শ্যামুয়েল, চেহারাটা একটু ভালো রাখবেন। এখন দেখে তো মনে হয় একটা গুলির আওয়াজেই সাবাড় হয়ে যাবেন আপনি---

তা তো যাবই। কিন্তু কাদের জন্যে?

কেন? রাজার জন্যে—মাটিতে পা ঠুকে বুটের জোর আওয়াজ করত শ্যামুয়েল। যেন সে নিজেই আসল রাজা। লোক-লস্কর নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে।

হুঁ? আস্তে বলত চক্রবর্তী, রাজায়-রাজায় যুদ্ধ বাধে আর উলুখড়ের প্রাণ যায়। মরবার জন্যেই তো জন্ম হয়েছে আমাদের। নিজে মরতে ভয় পাই না কিন্তু মারতে হবে ভেবেই দুঃখ হয়—

হো হো করে হেসে উঠত শ্যামুয়েল, কাকে মারবেন আপনি? বন্দুক ছুঁড়তে হাত কাঁপবে না?

কেমন হেঁয়ালী করে কথার উত্তর দিত চক্রবর্তী, না, শ্যামুয়েলের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলত, হাত কাঁপে নি। তবে বুক কাঁপে। মন কাঁদে। দিনের পর দিন আর কত গুলি খাবে পরিবার?

আস্তে আস্তে মন খুলত চক্রবর্তী। সহজ ভাষায় সত্যি কথাটাই বলত শ্যামুয়েলকে। বললে হবে কী, ঝকমকে পোশাকের পিছনে, উগ্র সৈনিক জীবনের অভ্যন্তরে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ তার কানে পৌঁছায় নি তখন।

কিন্তু আজ হিংস্র সৈনিকের বেশ খুলে ফেলেছে শ্যামুয়েল। তার হাতে ছোরা নেই, পিস্তল নেই, বন্দুক নেই। ট্রাকের ঘর্ঘর আর কামানের গর্জন শোনা যায় না বলে শুধু মানুষের কান্নাটাই শুনতে পায় সে।

রেণুকে বিয়ে করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাবার পরই চক্রবর্তীর সঙ্গে বেশি ভাব জমল শ্যামুয়েলের। অল্পে অল্পে যেন ব্যথাও বুঝল তার। ওদের দুজনের দুঃখ মিলে কেমন এক ধরনের জ্বালার সৃষ্টি করল শ্যামুয়েলের মনে। চক্রবর্তীর মতোই ঝিমিয়ে পড়ত সে।

কলকাতারই লোক চক্রবর্তী। কসবায় ছোট দুখানি ঘর তার। লেখাপড়া জানে কিছু কিন্তু কাজ পায় না কোনো। মুদি আর ওষুধের দোকানে খাতায় হিসেব লিখে সামান্য যা রোজগার করে তাতে সংসার চালানো যায় না। পাঁচটি ছেলেমেয়ে চক্রবর্তীর। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো নয়। ভীতু স্বভাব। কথায়-কথায় চমকে ওঠে। রাতে ভয় পেয়ে বার বার স্বামীকে জাগায়।

খোঁচা দিয়ে কথা বলে চক্রবর্তী, রাজার জন্যে নয়, পেটের জন্যে যুদ্ধ করতে এসেছি। আসবার আগে বড় কেঁদেছিল বউ। ভীতু মানুষ। কেমন করে দিন কাটায় ভাবি। আমার আশায় পথ চেয়ে বসে আছে। কে হারবে, কে জিতবে ওসব কথায় দরকার কী আমার। নিজের সংসারের কথা ভেবেই বুকটা শুকিয়ে যায়।

বিয়ের পর এসব কথার অর্থ বুঝল শ্যামুয়েল। সে-ও যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়েছে ওই এক কারণেই। কিন্তু নাম লিখিয়ে তারও মাথাটা রীতিমতো গরম হয়ে উঠেছিল। যেন সে যা খুশি তাই করতে পারে। খাবার কেড়ে খাও। মানুষ চাপা দাও। নিরীহ লোককে বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখাও। সকলের কাছে খাতির আছে বইকি তার। তখন রেণু ছিল না।

রেণু আসবার পরেই তো নিজের সঠিক অবস্থাটা বুঝতে পারল শ্যামুয়েল। ঘরে ফিরে যাওয়া চলবে না এখন। ভালোবাসা চলবে না। দুই কান খাড়া রাখতে হবে। জীবন তুচ্ছ করতে হবে। মরতে হবে। মারতে হবে। বারুদের গন্ধে নাক জ্বলে শ্যামুয়েলের। সে মরতে চায় না। মারতে চায় না। সে ভালোবাসতে চায়।

কিন্তু সুবেদারের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। জোরে আঘাত করে শ্যামুয়েলকে। তাড়া দেয়। বন্দুক ঘাড়ে দৌড় করায় মাইলের পর মাইল। সব দয়া মায়া ভুলিয়ে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর করে তুলতে চায়। কিন্তু গোলা-বারুদের ঝাঁজেও মধুর গন্ধটা মুছে যায় না শ্যামুয়েলের মন থেকে।

মণিপুরের কোনো অঞ্চলে মিলিটারি ছাউনি পড়েছে। প্রায় জঙ্গল বললেই হয়। জনমানবের সাড়া নেই। এখানে-ওখানে যাদের দেখা পাওয়া যায় তারা কেউ কাছে এসে কথা বলে না। সৈন্যদের দেখে ভয়ে দূরে পালিয়ে যায়।

দেশী বিদেশী সব রকম ওষুধ চার পাশে ছড়িয়ে সতর্কতা অবলম্বন করলেও মশা আর নানারকম পোকা-মাকড়ের কামড় থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। তা ছাড়া বেশিক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার উপায় নেই। রান্না করতে হয়। বাসন মাজতে হয়। দরকার হলে সাহেবদের ফাই-ফরমায়েশও খাটতে হয়।

কোনো কোনোদিন খাওয়াও জোটে না পেট ভরে। মাছ মাংস এসে পৌঁছয় না এত দূরে। টিনের মাছ মাংস আর দামী মদের বোতল জমানো থাকে সাহেবদের জন্যে। এরা যেন কুকুর-বেড়াল। মাথা তুলতে গেলেই তাড়া খায়।

রাত হলেই চক্রবর্তীর চেহারাটা একেবারে বদলে যায়। কী করছে তার বউ এখন। ছেলে-মেয়েরা কেমন আছে। ঠিক মতো বাড়িতে টাকা যাচ্ছে কিনা সে বুঝতে পারে না। ছটফট

করে। হাত ধরে শ্যামুয়েলকে টেনে নিয়ে যায় তাঁবুর এক কোণায়।

অদ্ভুত একটা চিৎকার ভেসে আসছে। জন্তু না পাখি কে জানে। অনেক দূরে কারা যেন হল্লা করছে। মানুষ না পশু বুঝতে পারে না ওরা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

কী হবে শমু যদি মরে যাই ?

না না, মরবে কেন।

এমন জায়গায় এনে ফেলেছে আমাদের যে-কোনো সময় শেষ হয়ে যেতে পারি—

বুক কাঁপে শ্যামুয়েলের, দূর, কিছু হবে না।

মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও চক্রবর্তী জ্বলে ওঠে, গোলামি করে জীবন গেল। কিন্তু প্রাণ নিয়ে গোলামি সহ্য করতে পারি না শমু। চলো আমরা ঘরে পালিয়ে যাই। এমন ভাবে একা একা টাকা রোজগার করবার দরকার নেই আমার। বাড়ি বসে উপোস করা ভালো। তাহলে এক সঙ্গে মরতে পারব তো।

এইবার যুদ্ধ থেমে যাবে, চক্রবর্তীর কাঁধে হাত দিয়ে শ্যামুয়েল তাকে সান্ত্বনা দিত, আমরা সকলে মরে যাব নাকি ভাব তুমি অ্যাঁ ? চক্রবর্তীর দুঃখ লাঘব করবার জন্যে জোরে হেসে উঠত সে।

শ্যামুয়েল ঘরে ফিরে এসেছে কিন্তু নিজের সংসারে আর ফিরে যেতে পারে নি চক্রবর্তী। দুর্ভাবনার দিন শেষ হয়েছে তার। চক্রবর্তীর সংসারের ভাবনা আজও কিন্তু থেকে থেকে বিষণ্ণ করে তোলে শ্যামুয়েলকেই। কী হল তার ভীতু বউএর—কোথায় ছিটকে পড়ল তার সন্তান—সে-খোঁজ নিতে ইচ্ছে হয় তার। কিন্তু চক্রবর্তীর ঠিকানা কোনোদিনও তো জিজ্ঞেস করে নি সে।

বিউগল বাজে হঠাৎ। মাঝে মাঝে গুলির শব্দ শোনা যায়। সাহেবদের তাঁবুতে কোলাহল থেমে গেছে। মাথার ওপর দিয়ে প্লেন উড়ে যায়। কী খবর দিয়ে যায় কে জানে।

টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মশা বেড়েছে। পোকা-মাকড়ের উপদ্রব বেড়েছে। ঠাণ্ডাও ভারী হয়েছে আরও। ঠকঠক করে কাঁপে চক্রবর্তী আর শ্যামুয়েল। দূরের পাহাড়টা আস্তে আস্তে যেন কাছে আসে। সেদিকে তাকিয়ে ওরা দুজন দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

অথচ দুদিন আগে শ্যামুয়েল একেবারে অন্যরকম ছিল। বুক ফুলিয়ে সকলের সামনে জোর গলায় প্রায়ই বলত, মরতেই যদি হয় তাহলে বিছানায় শুয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে নয়—পুরুষের মতো যুদ্ধ করতে করতে হাজারটাকে মেরে তবে নিজে মরব—

তখন একটাও জীবনের দাম বোঝবার ক্ষমতা ছিল না শ্যামুয়েলের।

শীতের মাত্রা বেড়ে গেল সকাল বেলা। হু হু ঠাণ্ডা হাওয়ায় দেহ হিম হয়ে যায়। বৃষ্টি তো লেগেই আছে কাল রাত থেকে। প্রত্যেকের চোখ-মুখ উত্তেজনায় অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। পাণ্ডুর। ফ্যাকাশে! কী হবে, কী হবে এমনি একটা ভাব।

সুবেদার যাকে সামনে পাচ্ছে তার সঙ্গেই উত্তেজিত স্বরে কথা বলছে, এ বুদ্ধু, উধর গয়া কেঁও? বাহার মৎ যাও। চুপসে ঠার উল্লু—

নিজেও বকুনি খাচ্ছে ক্যাপটেনের কাছ থেকে কথায় কথায়। সকলেই বিচলিত ভীত। শঙ্কিত উত্তেজিত। কিন্তু কেউই বোধ হয় সঠিক জানে না কী ঘটছে কোথায়। চারপাশে তাকিয়ে শুধু এইটুকু আন্দাজে বুঝতে পারে যে শত্রু খুব কাছে এগিয়ে এসেছে—এদের ওপর যে-কোনো মুহূর্তে বোমা ফেলতে পারে।

বোমা যদি ঠিক ওদের ওপর না পড়ে কাছাকাছি কোথাও পড়ে তাহলেও অবস্থা যে কী হবে সে কথা অনুমান করা কঠিন হয় না কারুর পক্ষে। ভয় আর আশঙ্কার মাঝে কাটে সারাদিন। সাড়া শব্দ বেশি নেই। আহারেও যেন রুচি নেই ওদের।

কিন্তু কোনো বিপদ ঘটল না দিনের বেলা। রাতেও কোনো সঙ্কেত পাওয়া গেল না সুবেদারের কাছ থেকে। শুধু জেগে থাকতে হবে। একটি লোকও যেন আজ না ঘুমোয়। ঘুমবার সময় নাকি এখন। কার চোখে ঘুম আসবে।

শীতের জ্যোৎস্না রাত অদ্ভুত মায়া জাগিয়েছে পাহাড়ের গায়। কুয়াশা জমেছে। পাহাড়টা যেন রুপোর। তাল তাল রুপো সাজিয়ে রাখা হয়েছে ওখানে। কে মরতে চায়। কে যেতে চায় এই অপরূপ মায়াময় পৃথিবী ছেড়ে।

ওই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে এরা শুধু ভাবছে প্রহরে প্রহরে মৃত্যু এগিয়ে আসছে। হয় আজ, নয় কাল-- তার আলিঙ্গনে লুপ্ত হয়ে যেতেই হবে এদের। হঠাৎ প্রতিবাদ জাগে মনে। জীবনের দাম বেড়ে যায় অনেক। মৃত্যুর মধ্যে কোনো কৃতিত্বের পরিচয় পায় না কেউ। কারণ যাই হোক না কেন।

সতর্ক হয়ে বসে থাকে সকলে। এমন অবস্থা আগেও হয়েছে অনেকবার। তাই বাঁচবার আশা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় না মন থেকে। জেগে জেগেই হয়তো রাত কেটে যাবে। ওরা টিকে থাকবে যেমন আছে তেমন। শুধু চক্রবর্তী দিশা হারায়।

মধ্য রাত্রি পার হয়ে গেল। কিন্তু কোনো বিপদ হল না। শব্দ পাওয়া গেল শেষ রাত্রে। কিছু দেখা যায় না। দেখবার সাধও হয়তো কারুর নেই। মৌমাছির ঝাঁকের মতো গুনগুন শব্দ-- এ আওয়াজ চেনে সকলেই।

ক্যাপ্টেনের কঠিন নির্দেশে এতটুকু উত্তেজনা প্রকাশ করতে পারল না কেউ। কিন্তু চঞ্চল হয়ে উঠেছে সকলে। মাথার ওপর শত্রুর প্লেন। এদের ছাউনি অনুমান করতে পরলে আয়ুর মেয়াদ আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত।

বুক ঘষে ঘষে সাবধানে ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিতে হল। ঠাণ্ডা মাটির ভ্যাপসা গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। মসৃণ দেহ ঠেকে পায়ে।

হিংস্র শ্বাপদ না নিরীহ জানোয়ার বোঝা যায় না। কিছু করে না। নড়েও না। ওটাও ভয় পেয়েছে বোধ হয়।

বুকের কাঁপন দ্রুত হয় শ্যামুয়েলের। রেণুকে মনে পড়ে সারাক্ষণ। হঠাৎ প্রচণ্ড আওয়াজে সারা পৃথিবীটা যেন গুঁড়িয়ে যায়। তারপর শ্যামুয়েলের আর কিছু মনে নেই।

ট্রেঞ্চের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে সে নাকি মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল। ভাগ্য ভালো তার। তাই শুধু একটা পা কাটা গেছে। বারো মাইল দূরে হাসপাতালে রাখা হয়েছে শ্যামুয়েলকে। বেঁচে যাবে। আর আশঙ্কা নেই তার জীবনের। কিন্তু এ-দলের অনেকে একে-বারে শেষ হয়ে গেছে শত্রুর বোমায়। সব চেয়ে আগে শ্যামুয়েলের মনে পড়ল চক্রবর্তীর নাম।

সে আর এ পৃথিবীতে নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে চলে গেলে শ্যামুয়েলের পাশে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে রেণু বলে, এবার বিজুর যা হোক একটা ব্যবস্থা করে দাও গো—

কিছু বোঝে না শ্যামুয়েল, কী হল বিজুর ?

ভাইএর বেটাকে কোলে নিয়েই জীবন কাটবে নাকি ওর ? বিয়ে-থা দিতে হবে না ?

ঠিক কথাই বলে রেণু। সত্যিই তো বিজলীর বিয়ের কথা একবারও ভাবে নি শ্যামুয়েল। মা-বাবা নেই এখন। বড় ভাই সে। সংসারের সব ভাবনা তাকেই যে ভাবতে হবে। এতদিন বিজলীর ঘর-সংসারের কথা কেন তার মাথায় আসে নি সেটাই আশ্চর্য।

কিন্তু কার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করবে তার। বিজলীর কাছে এসব কথা তুলতে ইতস্তত করে শ্যামুয়েল। ললিতের কথা ভেবে অনেকদিন পর মনটা আবার খারাপ হয়ে যায়।

যুদ্ধে যেতে চায় নি ললিত। শ্যামুয়েল জোর করে তাকে রাজী করায়। সরলাকে দিয়ে বলায়। বসন্তকে দিয়ে অনুরোধ করায় ছেলের সঙ্গী হয়ে যেতে। জোয়ান বয়েস ললিতের। প্রাণের ভয়ে ভীরুর মতো কথা বলা সাজে না। সরলা বোঝায়। বসন্ত জোর করে রাজাকে জিতিয়ে দেবার কাজে সাহায্য করতে।

ছেলেবেলায় জাত-বসন্তে মা-বাপ মারা যায় ললিতের। অনাথ আশ্রমে মানুষ। সামান্য একটা কাজ করত পাদ্রীদের ছাপাখানায়। থাকত ঠাকুর পুকুরে। শ্যামুয়েলের টানেই আসত প্রথম প্রথম তাদের বাড়িতে। পরে আসত বিজলীর টানে। যেন তাকে বিয়ে করতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে তার।

সেই ললিত মরল শ্যামুয়েলের চোখের সামনে। আসামের কাছাকাছি কত হাজার ফুট নিচে ট্রাক থেকে পড়ল খাদের মধ্যে। ড্রাইভারটা কিন্তু ভালোই ছিল। সব কথাই মনে আছে শ্যামুয়েলের। সে আসছিল পিছনের গাড়িতে।

রাতারাতি পাততাড়ি গুটিয়ে অন্য জায়গায় ছাউনি ফেলবার কথা ওদের। শুধু চড়াই আর উৎরাই। রাস্তা খারাপ। ট্রাক লাফায় বড় বেশি। হঠাৎ ঝড় এসে পড়ায় চোখে ধাঁধা লেগে যায় ললিতের গাড়ির ড্রাইভারের। একটা বড় গাছের সঙ্গে জোরে ধাক্কা মারে। সেই ধাক্কায় ললিত একাই পড়ল ছিটকে।

শ্যামুয়েলের মুখে গল্পটা আবার নতুন করে শোনে রেণু। কিছু-ক্ষণ চুপ করে থাকে। কিন্তু বেশিক্ষণ মুখ বুজে থাকা স্বভাব নয় তার। ইচ্ছে হয় বিজলীকে ঘুম থেকে তুলে সান্ত্বনা দিয়ে দুঃখ ভুলিয়ে দেয়।

চাপা স্বরে বলে রেণু, মধুর সঙ্গে ভাব আছে না বিজুর?

তা আছে বটে।

একবার জিজ্ঞেস করে নিলে হয় না?

কী?

দূর, কিছু বোঝ না তুমি, বিরক্তির ভান করে রেণু, বলছিলাম যে ওদের দুজনের মতটা একটু জেনে নিলে হয় না ?

জান।

মধুকে তুমি বলবে কিন্তু, একটু থামে রেণু, আর বিজুকে কাল সকালেই আমি বলব।

বেশ, রেণুকে আরও কাছে টানে শ্যামুয়েল।

কালীতারাকে নিয়ে ভাবনার শেষ নেই মধুর। দিনে দিনে বুড়ির অবস্থা খারাপ হয়। কী যে হয়েছে তার! কোথাও একটু শব্দ হলেই চেঁচায়। ছুটোছুটি করে। মধুকে জড়িয়ে ধরে ঠক-ঠক করে কাঁপে। কাঁদে। ভিরমি খায়।

বুড়িকে একা বাড়িতে রেখে কাজে যেতে ভরসা হয় না মধুর। কখন কী হয় বলা যায় না। কালীতারা তাকে ছাড়তেও চায় না সহজে। পথ আগলে বলে, কোথা যাস ? কথা শোন মধু, ঘরের বার হস না। এই দেখ, মাথার ওপর উড়ো জাহাজ। বোমা ফেলবে ওরা। ওরে ও মধু, আর কেউ নাই আমার। তুই কাছে থাক বাপ--হাউমাউ করে কাঁদে কালীতারা। মাথার দোষ হয়েছে বোধ হয়।

মধু অনেক বোঝায় মাকে। বলে, আর ভয় নেই। যুদ্ধ প্রায় থেমে এসেছে। এ শহরে বোমা পড়বার কোনোই সম্ভাবনা নেই। আর দিন কয়েক পর আবার রাস্তার সব আলো জ্বলে উঠবে।

কিন্তু কালীতারা বোধ হয় বুঝতে পারে না মধুর কথা। সব শোনে না, বিশ্বাসও করে না। ছলো-ছলো চোখে তার দিকে তাকিয়ে বুড়ি বোধ হয় মৃত্যুর দিন গোনে। কপাল চাপড়ে দুঃখ করে, বিয়েটা দিয়ে যেতে পারল না মধুর—নাতির মুখ দেখে যেতে পারল না।

মায়ের রকম দেখে মধু ভয় পায়। অনভিজ্ঞ বলে সেবাও করতে পারে না ঠিক মতো। ডাক্তার ডাকবার কথা ভাবে। ভালো রকম চিকিৎসার দরকার বোধ হয় এখন। না হলে মধু হঠাৎ একদিন বাড়ি ফিরে দেখবে তার মা মরে পড়ে আছে একদিকে।

বিজলীর কাছে মায়ের ব্যাধির কথাটা অনেকদিন গোপন করে রেখেছিল মধু। সে জানে, খবর পেলেই বিজলী ছুটে আসবে কালীতারাকে দেখতে আর যেমন বড় মন তার, সেবাও করবে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে।

কিন্তু কালীতারার কথা ভেবেই বিজলীকে এতদিন তার কথা বলতে সঙ্কোচ করেছিল মধু। ওদের ওপর তো প্রসন্ন নয় বুড়ি খুব। মুখের ওপর কখন কী বলে বসে বলা যায় না।

যদিও সেই বোমা পড়বার রাত্রে বিজলীর সঙ্গে পাশাপাশি বসে থাকবার পর জ্বালাটা অনেক কমে গেছে কালীতারার। তারপর মধু কতবার গেছে ওদের ওখানে মাকে বলেই। বুড়ি চেঁচামেচি করে নি—মুখ ভার করে থাকে নি—গলা ছেড়ে অভিশাপও দেয় নি তাকে।

এসব কথা ভেবে সাহস করে মধু বিজলীকে মায়ের অসুখের কথা বলেই ফেলে। তার সাহায্য নিতে মন উন্মুখ হয়ে ওঠে মধুর।

খবর পেয়ে কালীতারাকে দেখতে আসে বিজলী। চারপাশের বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে বিরক্ত হয় মধুর ওপর। অনুযোগ করে, কেন এতদিন খবর দেয়া হয় নি তাকে। মধুর উত্তরের অপেক্ষা না করে কাজে লেগে যায় বিজলী। সব চেয়ে আগে জোর করে শুইয়ে দিতে চায় কালীতারাকে।

কালীতারা সরে যায়। ছোঁয়া বাঁচিয়ে শঙ্কিত হয়ে বলে,

ঘরে কাজ কী তোমার? মধুর সাথে গল্প করতে এয়েচ—হোথায় বাইরে কথা কইলেই তো কাজ চুকে যায়--

বিজলী বাধা দিয়ে বলে, আপনার সেবা করতে এসেছি।

উঃ, দরদ কত! তোমার সেবায় কাজ নাই আমার।

হঠাৎ কী মনে পড়ে কালীতারার। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বিজলীর দিকে। বোমার ভয় নেই এ মেয়ের। নিজেকে একেবারে অসহায় মনে হয় তার। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। বিজলী তাড়াতাড়ি তাকে জোর করে তুলে তক্তাপোশে শুইয়ে দেয়। মাথার কাছে বসে নিপুণ হাতে সেবা করে। আশ্বাস যেন এসব কাজ সে ভালো করেই জানে—এসব কাজ সে কতোই করেছে।

পরদিন কালীতারা আব্দার করে। বায়না ধরে। বিজলী যেন তার চেয়ে বয়েসে অনেক বেশি বড়—তার চেয়ে অনেক বেশি বোঝে। বিজলীও সমানে বকে বুড়ির সঙ্গে। সে যে কিছুতেই মরতে পারে না এখন সেকথা জোর করে বোঝায়। আর পাঁচ জনের সঙ্গে তার তুলনা করে কথা বলে বিজলী।

ওই তো হারুর মা—চেনেন না তাকে? নব্বুই বছর বয়েস। খটখট করে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। আপনার বয়েসে এমন ভেঙে পড়ে নাকি মানুষ?

ভয় করতে নাই বুঝি?

না না, ভয়টা কিসের?

কালীতারার চোখ বেয়ে জল পড়ে, ছেলেটার কথা ভাবি। কে দেখবে তারে। নিজের ভালো বোঝে না--

বিজলী বুড়ির মাথায় হাত বুলিয়ে হেসে বলে, আপনি থাকলে ভাবনা কী মধুর। দুদিন একটু চুপচাপ শুয়ে থাকুন, তারপর আবার ছেলের জন্যে সব করবেন আপনি।

কালীতারাকে কোনো কাজ করতে দিতে চায় না বিজলী।

মনের অবসাদে ভেঙে পড়েছে বুড়ি। ভালো কথা বলে মনের তেজ ফিরিয়ে আনা দরকার সব চেয়ে আগে। যতক্ষণ পারে ততক্ষণ বিজলী মাথার কাছে বসে থাকে তার।

মধু প্রবল ভাবে আপত্তি করে বলে, বিজলীব এত খাটাখাটি চলবে না এ বাড়িতে। এমন করলে তাব নিজের শরীর ভেঙে পড়বে যে।

মধুকে ধমক দেয় বিজলী। বলে, তার স্বাস্থ্য এত খারাপ নয় যে একটুতেই ভেঙে পড়বে। এমন কিছুই সে করে নি এক-দিনও যার জন্যে ভারী অসুখে পড়তে পারে।

আসলে কালীতারাকে সেবা করবার মধ্যে বিজলী একটা নতুন আনন্দের স্বাদ পায়। কোনো দৈন্য অনুভব করে না মনে। ধর্মটা কালীতারার ভিন্ন বুঝেই আন্তরিক ভাবে সেবা করবার দ্বিগুণ উৎসাহ পায়। মাঝে মাঝে মধুর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে সেকথাটা তাকেও যেন বুঝিয়ে দিতে চায়। মধু কী বোঝে কে জানে, বিজলীর দিকে তাকিয়ে সে-ও হাসে।

রাতেও কালীতারা ছাড়তে চায় না বিজলীকে। তার হাত টেনে বলে, যেতে দেব না। ও মেয়ে, তুমি গেলে আমি আজ রাতেই মরে যাব ঠিক—

কী বল মা, বিরক্ত হয়ে মধু বলে ওঠে, খাটিয়ে খাটিয়ে মারলে যে বিজুকে। নিজের ঘর-সংসার নাই ওর?

তুই থাম মুখপোড়া ছেলে। ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোস সারা রাত। গলা কাঠ হয়ে যায় চেঁচিয়ে—একটু জল দিতে পারিস না তুই। আমার কোন কাজে লাগিস শুনি?

বিজলী আস্তে বলে, আমি অনেকক্ষণ থাকব। আপনি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন।

তোমায় আমি ছাড়ব না বাছা—বেশ জোরে বিজলীর একটা হাত ধরে পাশ ফেরে কালীতারা।

অনেকক্ষণ গায়ে হাত বুলিয়ে বিজলী ঘুম পাড়ায় তাকে। তারপর উঠে দাঁড়ায়। সজাগ থাকতে বলে মধুকে। মধু এগিয়ে আসে তাকে পৌঁছে দিতে। বিজলী বারণ করে কালীতারাকে একা ফেলে এখন ঘরের বার হতে। কথা শোনে না মধু। বিজলীর পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় অনেক দূর।

ধমক খেয়ে পিছন ফেরে।

যুদ্ধ থেমে গেছে।

রাস্তার যত আলো আবার অনেকদিন পর প্রথম জ্বলে ওঠে সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার আগেই। আজ হয়তো একটি লোকও ঘরে বসে নেই।

শহরের পথে ঘুরতে ঘুরতে ধাঁধা লেগে যায় চোখে। আনন্দে জোরে জোরে হাঁটে সব লোক। গাড়িগুলোর গতিও বেড়ে যায় অনেক। অন্ধকারের ভীত ত্রস্ত মানুষ হঠাৎ যেন নির্ভীক হয়ে উঠেছে।

কবরখানার দিকেই আস্তে আস্তে যায় বিজলী। একা। সকলকে এড়িয়ে। পা কাঁপে চলতে চলতে। যেন একটা ভারী অসুখ থেকে এইমাত্র সেরে উঠল! জ্বর ছেড়ে গেছে, ঘোর কাটিতে চায় না। কেমন অদ্ভুত এক ক্লান্তি আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার দেহমন।

মা-বাবার কবরের ধারে বিজলী বসে থাকে অনেকক্ষণ। দূরের সব কবরও চোখে পড়ে তার। গাছগুলিও দেখতে পায়। অবাক হয়ে যায় বিজলী। এপাশে ওপাশে ফিরে সামনে পিছনে তাকায়। এতদিনের পুরনো জায়গাটা একেবারে অচেনা মনে হয় তার।

আলোর রেখা এসে পড়েছে কবরখানায়। বিজলীর নিজের দেহটাও তাই অন্যরকম দেখায়। সে দেখে গাছ ঘাস মাটি

আর নিজেকে বার বার। যেন আর কেউ নেই কবরখানার অন্ধকারে। শুধু সে একাই বুঝি বসে আছে এখানে।

কী ভাব বিজু? সাবধানে বিজলীর পাশে বসে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে মধু।

তার স্বর শুনে বিজলী চমকে ওঠে না। নিজের ছায়ার মতো মনে হয় তাকে। থেমে থেমে বলে, ভাবনার কি শেষ আছে মধু? তোমাদের সকলের কথাই ভাবি—

এইবার ভাবনার শেষ কর বিজু—আলোর রেখায় মধুর মুখটাও অন্যরকম দেখায়। মনের সব সঙ্কোচ সতর্কতা ভেসে যায়। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে।

ইঙ্গিত বোঝে বিজলী। স্বভাবসুলভ লজ্জায় মুখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার মা কেমন আছেন?

তোমার নামেই বিভোর দিনরাত। তোমার সেবা না পেলে মা টিকবে না বিজু, বিজলীর একটা হাত নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে মধু বলে, আমারও যে প্রাণ পোড়ে—

মাথা নিচু করেই তাজা ঘাসের ওপর হাত বুলোয় বিজলী, আমার মতো একটা মেয়ের জন্যে--

নির্ভীক পুরুষের মতো প্রতিবাদের স্বরে মধু বাধা দেয়, মন দিয়েছি না সেই কবে?

নিবিড় সমবেদনায় সারা দেহ কাঁপে বিজলীর। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না হিংসা-কলহের মধ্যে দিয়ে অন্য কোনো স্বর্গে গিয়ে পৌঁছেছে ললিত। কবরখানার অন্ধকারে ললিতের আত্মাকে অনুভব করে বিজলী মধুর মধ্যেই। তার পাশে বসে এই পৃথিবীতেই এক আশ্চর্য স্বর্গের সন্ধান পায়।

মাথার ওপর অনেক বড় আকাশের দিকে চোখ তুলে বিজলী তাকায়। তুষারশুভ্র টানা একটা রেখা হালকা মেঘের কোল ঘেঁষে চলে গেছে অনেক দূর। তার শেষ দেখতে পায়

না সে। সেইদিকে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। আলো অন্ধকারে।

হাওয়া ওঠে কবরখানায়। ধুলো ওড়ে। সুরকির লাল রঙ লাগে গাছের শুকনো পাতায়।

ওরা বেরিয়ে আসে। কবরখানা থেকে বাইরে। মৃত্যুর নিস্তব্ধতা থেকে জীবনের কোলাহলে।

অন্ধকার থেকে আলোকে।